وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-١٠٣)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-٣١٨)

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক আল-ইতিছাম

الاعتصام

ইবনু আব্বাস ﵄ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আব্দুল কায়েসকে বললেন, ‘নিশ্চয় তোমার মধ্যে এমন দু’টি স্বভাব রয়েছে যা আল্লাহ পছন্দ করেন; ১. সহনশীলতা ২. চিন্তাভাবনা করে কাজ করা’ (ছহীহ মুসলিম, হা/১৭; মিশকাত, হা/৫০৫৪)।

● ৬ষ্ঠ বর্ষ ● ৫ম সংখ্যা ● মার্চ ২০২২

Web : www.al-itisam.com

৬ষ্ঠ বর্ষ
৫ম সংখ্যা
মার্চ-২০২২
ফাল্গুন-চৈত্র ১৪২৮
রজব-শা'বান
১৪৪৩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

মাসিক আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

প্রধান সম্পাদক

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

সার্বিক সম্পাদনায়

আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ

সার্বিক যোগাযোগ

মাসিক আল-ইতিছাম

■ প্রধান সম্পাদক,
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী;
তুবা পুস্তকালয়, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩

■ সম্পাদনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৮

■ ব্যবস্থাপনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৯

■ সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪১

■ ফাতাওয়া হটলাইন : ০১৪০৭-০২১৮৪২ (বিকাল ৪:০০মি.-৫:৩০মি.)

■ ই-মেইল : monthlyalitisam@gmail.com

■ ওয়েবসাইট : www.al-itisam.com

■ ফেসবুক পেজ : facebook.com/alitisam2016

■ ইউটিউব : youtube.com/c/alitisamtv

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

■ জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ :
০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮ , ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯

■ জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী :
০১৭৮৭-০২৫০৬০ , ০১৭২৪-৩৮৪৮৫৫

■ জামি'আহর উভয় শাখার জন্য :
০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ , ০১৭১৭-৯৪৩১৯৬

■ জামি'আহর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করতে :
বিকাশ পারসোনাল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭
বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

হাদিয়া

২৫/- (পঁচিশ টাকা) মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	ষাণ্মাসিক	বাৎসরিক
সাধারণ ডাক	২০০/-	৪০০/-
কুরিয়ার সার্ভিস	৩০০/-	৬০০/-

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ কর্তৃক প্রকাশিত এবং আল-ইতিছাম প্রিন্টিং প্রেস, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

◈ সম্পাদকীয় ০২

◈ প্রবন্ধ

» হজ্জ ও উমরা (পর্ব-১৯) ০৪
-আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

» সূরা আন-নাবা : মানবজাতির জন্য হাদিয়া (পর্ব-৬) ০৬
-হাফেয আব্দুল মতীন মাদানী

» স্কুল-কলেজ ও মাদরাসাশিক্ষার বৈষম্য ০৮
-ড. মো. কামরুজ্জামান

» অহির বাস্তবতা বিশ্লেষণ-৪র্থ পর্ব (মিন্নাতুল বারী-১১তম পর্ব) ১১
-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

» হক্কের মানদণ্ড (পর্ব-৩) ১৪
-মূল (উর্দূ) : সাইয়্যেদ মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী (রহিমাহুল্লাহ)
অনুবাদ : আখতারুজ্জামান বিন মতিউর রহমান

» মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার ১০টি উপায়! (শেষ পর্ব) ১৭
-আতাউর রহমান

» শবেবরাত পালন করা বিদআত ১৯
-অধ্যাপক ওবায়দুল বারী বিন সিরাজউদ্দীন

» শা'বান মাসে নফল ছিয়াম ও ছালাত ২২
-মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন

◈ হারামাইনের মিম্বার থেকে

» চিন্তা ও উৎকণ্ঠা দূর করা ২৫
-অনুবাদ : মাহবূবুর রহমান মাদানী

◈ তরুণ প্রতিভা

» সবচেয়ে ভালো মানুষ কারা? ২৮
-মো. দেলোয়ার হোসেন

◈ সাময়িক প্রসঙ্গ

» হিজাবী মুসকান এবং ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি ৩১
-জুয়েল রানা

◈ দিশারী

» বন্ধু আমার! পাপ করো না, পাপ হয়ে গেলে তওবা করতে ভুলো না (পূর্ব প্রকাশিতের পর) ৩৪
-জাবির হোসেন

◈ নারীদের পাতা

» নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলাম ৩৬
-হাফেয আব্দুর রহমান বিন জামিল

◈ গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

» জান্নাতের মেহমান ৩৯
-মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ

◈ কবিতা ৪০

◈ বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক ৪১

◈ সওয়াল-জওয়াব ৪৩

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

স্বাধীনতার মাসে দেশের শান্তি-সমৃদ্ধির শপথ নিন

১৯৪৭ সালের কথা, ভারতবর্ষকে বিভক্ত করে ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি পৃথক রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে গঠিত হয় পাকিস্তান। মূলত পূর্ব পাকিস্তান পূর্ব বাংলা হিসেবে গঠিত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের অধীনে থাকে সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পশ্চিম পাঞ্জাব ও বেলুচিস্তান। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাঙালিদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ ও শোষণ পরিলক্ষিত হয় এবং বাঙালিরা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে শুরু করে। উর্দূকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির অবজ্ঞা করার ব্যাপারটা তো রয়েছেই। ফলে এসবের বিরুদ্ধে বাঙালিরা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়। বস্তুত ১৯৪৮-১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়, ১৯৬২-১৯৬৩ সালে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ— এ সবই ছিল সেই প্রতিরোধের ধারাবাহিকতা। ১৯৭১-এর ২৬ মার্চ বাংলার মানুষ সেসব শোষণ প্রতিহত করার জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জিত হয়; বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব হয়।

কিন্তু স্বাধীনতার ৫০ বছর পেরুলেও আমরা কি সত্যিকার অর্থে কাঙ্ক্ষিত সমৃদ্ধি অর্জন করতে পেরেছি? আসলে প্রকৃত শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জন করতে হলে সরকার ও জনগণ সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের দায়িত্ব যথারীতি পালন করতে হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে সরকারের জন্য জনগণের যেমন কিছু কর্তব্য রয়েছে, তেমনি জনগণের জন্যও সরকারের রয়েছে অনেক কর্তব্য। **জনগণের কর্তব্যের মধ্যে রয়েছে-** ১. সরকারের সাথে কৃত বায়আত রক্ষা করে চলা। রাষ্ট্রের শান্তি, শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতার জন্য বায়আতে কৃত অঙ্গীকার পূরণ করা অতীব জরুরী *(আল-মায়েদা, ৫/১; বুখারী, হা/৩৪৫৫; মুসলিম, হা/১৮৪২)*। ২. শরীআতের বিরোধিতা না হয়ে গেলে সরকারের আনুগত্য করতে হবে *(আন-নিসা, ৪/৫৯)*। ৩. সুখে-দুঃখে, কঠিন ও স্বাভাবিক অবস্থায় সর্বদা সরকারকে সাহায্য করতে হবে। ভেতরের বা বাইরের যে-ই রাষ্ট্রে ফেতনা করতে আসবে, তাদের বিরুদ্ধে সরকারের পক্ষে কাজ করতে হবে *(আল-হুজুরাত, ৪৯/৯; বুখারী, হা/২৯৫৭; মুসলিম, হা/১৮৪১)*। ৪. শাসকশ্রেণিকে নছীহত করতে হবে। এটা বিশেষ করে দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের কাজ হলেও সাধারণ জনগণও এর আওতায় পড়তে পারে। বিভিন্ন বিষয়ে সরকারকে নছীহত করা, তাদের ভুল শুধরিয়ে দেওয়া জনগণের দায়িত্ব *(মুসলিম, হা/৫৫)*। ৫. সরকার কর্তৃক ঘটিত অপছন্দনীয় ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করতে হবে। এমনকি অত্যাচার ঘটে গেলেও জনগণকে ধৈর্যধারণ করতে হবে *(বুখারী, হা/৭০৫৪ ও ৭১৪৩; মুসলিম, হা/১৮৪৯)*। ৬. সরকার যাতে দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে দেশ ও জনগণের জন্য কাজ করে যেতে পারে, সেজন্য বায়তুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তার জন্য বেতন-ভাতা নির্ধারণ করতে হবে *(তারীখু দিমাশক, ৩০/৩২১)*। ৭. শাসকগোষ্ঠীকে গালমন্দ করা যাবে না। শাসক ও জনগণের মধ্যে ভালো সম্পর্ক থাকা চাই। তাহলে শাসক যেমন জনগণের উপর আস্থা রাখতে পারবে, জনগণও তেমনি শাসকগোষ্ঠীর উপর আস্থা রাখতে পারবে। এভাবে দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে সবাই মিলে ভূমিকা রাখতে পারবে। পক্ষান্তরে এর বিপরীত হলে সবকিছু পিছিয়ে যাবে। সেজন্য ইসলাম শাসকগোষ্ঠীর সাথে ভালো সম্পর্ক রাখতে বলেছে *(ইবনু আবী আছেম, আস-সুন্নাহ, হা/১০১৫)*। ৮. শাসকগোষ্ঠীর সাথে প্রতারণা করা যাবে না। সাধারণভাবে এটা মারাত্মক অপরাধ; আর যদি তা সরকারের সাথে হয়, তাহলে তার ভয়াবহতা আরো বেশি। এতে দেশ ও জনগণের ক্ষতি হয়। সেকারণে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বপ্রকার প্রতারণা করতে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম, হা/১০২)*। ৯. রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎ করা যাবে না। শাসকগোষ্ঠীর সাথে খেয়ানত করে বা অন্য কোনো উপায়ে রাষ্ট্রীয় সম্পদ হাতিয়ে নেওয়া হারাম এবং এটা বড় ধরনের খেয়ানত *(বুখারী, হা/৩০৭৩; মুসলিম, হা/১৮৩১ ও ১৮৩৩)*। ১০. সরকারকে প্রকাশ্যে জনসম্মুখে নছীহত করা যাবে না। সরকারের নছীহত হবে কোমলতার সাথে গোপনে; প্রকাশ্যে নয় *(আহমাদ, হা/১৫৩৩৩; মুসলিম, হা/২৯৮৯)*।

অনুরূপভাবে **জনগণের জন্য মুসলিম শাসকের কাঁধেও রয়েছে বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।** দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ের সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধান শাসকশ্রেণির দায়িত্বের মূল বিষয়। এতদুভয়ের নিরাপত্তা রক্ষায় তাদেরকে সামাজিক, সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বহু গুরু দায়িত্ব পালন করতে হয় সরকারকে। যেমন— ১. দ্বীনের হিফাযত মুসলিম সরকারের প্রধান দায়িত্ব। এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম যে বিষয়টি আসবে, সেটি হচ্ছে দ্বীনের মূলনীতিসমূহ সংরক্ষণ ও নির্ভেজাল আক্বীদা লালন। সরকারকে একদিকে যেমন আক্বীদা, আমল, আখলাক, হুকুম-আহকাম বাস্তবায়নের চেষ্টা করতে হবে, তেমনি দ্বীনের

ব্যাপারে যাবতীয় ভ্রান্ত আক্বীদা-আমলকে দূরীভূত করতে হবে। ২. বিবাদমান দুই পক্ষের মধ্যে ইনছাফের সাথে বিচার-ফয়সালা করে দেওয়া সরকারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, যাতে যালেম আর সীমালঙ্ঘন করতে না পারে এবং মাযলূম ধীরে ধীরে আরো দুর্বল না হয়ে যায়। সেজন্য, সরকারকে যোগ্য ও ন্যায়পরায়ণ বিচারক নিয়োগ দিতে হবে এবং বিচারকার্য তদারকি করতে হবে। তবে, অন্যায়ভাবে বিচারকার্যে হস্তক্ষেপ করার অধিকার সরকারের নেই। অনুরূপভাবে শরীআত পরিপন্থী কোনো ফয়সালা বিচারক দিতে পারবেন না। ৩. শরীআত নির্ধারিত দণ্ডবিধি সরকারকেই বাস্তবায়ন করতে হবে। তাহলে সমাজে অপরাধ একেবারেই কমে যাবে। ৪. সরকারকে আদর্শবান হতে হবে। চরিত্র, আমল-আখলাকে জনগণের জন্য মডেল হতে হবে। সরকার ভালো হলে জনগণও ভালো হতে সচেষ্ট হবে। পক্ষান্তরে সরকার এর বিপরীত হলে জনগণও সেদিকে যাওয়ার চেষ্টা করবে। ৫. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধের দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। দ্বীন ও দেশ রক্ষায় এর বিকল্প নেই *(দ্র. আলে ইমরান, ৩/১০৪)*। অতএব, সরকার এমন কিছু লোক নিয়োগ দিবে, যারা এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করবেন। ৬. একটি জাগ্রত ইসলামী রাষ্ট্রের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জ্ঞান-বিজ্ঞান। দেশের শান্তি-সমৃদ্ধিতে এর ভূমিকা অসামান্য। সুতরাং সরকারের উপর এর পৃষ্ঠপোষকতা করা অতীব জরুরী। পক্ষান্তরে যেসব জ্ঞান দ্বীন ও দেশের জন্য ক্ষতিকর, সেগুলো নিষিদ্ধ করাও সরকারের দায়িত্ব। ৭. সরকারকে জনগণের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করতে হবে। তাদের উপর তাদের সাধ্যাতীত বোঝা চাপানো যাবে না *(মুসলিম, হা/১৮২৮)*। ৯. জনগণের হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়া এবং তাদের সাথে খেয়ানত না করা সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এক্ষেত্রে যদি সরকার সচেষ্ট হতে পারে, তাহলে সবাই সফলতার মুখ দেখতে পারবে। অন্যথা ফল ভালো হবে না *(মুসলিম, হা/১৪২)*। ১০. অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় দিক থেকে সরকারকে দেশের নিরাপত্তা রক্ষা করতে হবে। যাতে দেশের মধ্যকার বা বাইরের কেউ শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করতে না পারে, সেজন্য কার্যকরী পদক্ষেপ সরকারকে নিতে হবে। ১১. দেশের সীমান্ত রক্ষা করা সরকারের গুরু দায়িত্ব। সেকারণে, সরকারকে সীমান্ত রক্ষার জন্য বিশেষ সশস্ত্র বাহিনী গঠন করতে হবে, তাদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সমরাস্ত্র সরবরাহ করতে হবে, যাতে বহিঃশত্রু কর্তৃক দেশ আক্রান্ত না হয় *(আল-আনফাল, ৮/৬০)*। ১২. আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ পরিচালনা করা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ একটি সামরিক দায়িত্ব। সরকারের নেতৃত্বে জনগণের উপর আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ফরয। ১৩. ইসলামী আইন ও বিধিবিধান ক্বায়েম করা সরকারের রাজনৈতিক দায়িত্ব। দ্বীন ও রাজনীতির মধ্যে বিভাজন করে দ্বীনকে মসজিদে বন্দী করা যাবে না। ১৪. পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ত নেওয়া ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব *(আলে ইমরান, ৩/১৫৯)*। ১৫. যোগ্য নেতৃত্ব নির্বাচন সরকারের অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব। রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারবে এমন আমানতদার ও শক্তিশালী দায়িত্বশীল নিয়োগ দেওয়া সরকারের কর্তব্য, যাতে তারা রাষ্ট্র পরিচালনায় রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারেন *(আল-ক্বছাছ, ২৮/২৬)*। ১৬. সরকারকে অবশ্যই রাষ্ট্র ও জনগণের বিষয়াদি নিজে তত্ত্বাবধান করতে হবে। শুধু দায়িত্বশীলদের উপর নির্ভর করলে চলবে না। ১৭. জনগণের মধ্যে ইনছাফ প্রতিষ্ঠা করা সরকারের আরেকটি গুরু দায়িত্ব *(আন-নিসা, ৪/৫৮)*। ১৭. সরকারকে বৈধ পন্থায় রাষ্ট্রীয় তহবিল সমৃদ্ধির কাজে মনোনিবেশ করতে হবে। যাকাত, ছাদাক্বা, খারাজ, জিযিয়া এবং রাষ্ট্রের অন্যান্য আয় রাষ্ট্রীয় তহবিলের বৈধ উৎস হতে পারে। যাকাত উত্তোলন ও নির্ধারিত খাতে বণ্টন মুসলিম সরকারের অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব। ১৮. রাষ্ট্রীয় মালের সুষ্ঠু বণ্টন করা সরকারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চাকরিজীবীদের বেতন-ভাতা সহ অন্যান্য ব্যয়ের খাত যথারীতি হিসাব করে সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে মাল খরচ করতে হবে। কোনোভাবেই যেন মালের অপচয় ও অপব্যবহার না হয় সেদিকে সরকারকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। ১৯. সামাজিক সম্প্রীতি ও সংহতি গড়ে তুলতে হবে। একটি রাষ্ট্রের শান্তির জন্য জনগণের পারস্পরিক সম্প্রীতি, সংহতি, সৌহার্দ, সাহায্য-সহযোগিতা, আন্তরিকতার অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। সরকারকে এ দায়িত্ব পালন করতে হবে। ২০. সমৃদ্ধি ও উন্নতির বিভিন্ন মাধ্যম সহজ করে দিতে হবে। এখানে অনেক দায়িত্ব সরকারের কাঁধে চাপে। যেমন— জনগণের জন্য শিক্ষা, চিকিৎসা ও উপযুক্ত বাসস্থানের বিষয়টি সহজলভ্য করে দেওয়া, কৃষিকাজের জন্য সার্বিক সহযোগিতা করা, জনশক্তিকে কাজে লাগানো, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন করা। যেগুলো কোনোভাবেই দেশে উৎপাদন সহজ নয়, সেগুলো আমদানী ও সরবরাহের পথ সুগম করা ইত্যাদি।

আসুন! আমরা সরকার ও জনগণ পরস্পরের দায়িত্ব যথারীতি পালনের মাধ্যমে একটি সুখী-সমৃদ্ধ দেশ গড়ার প্রত্যয় নিই। এটাই হোক স্বাধীনতার মাসের অঙ্গীকার। মহান আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!

হজ্জ ও উমরা

-আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

(পর্ব-১৯)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ وَرَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি জামরাতুল কুবরার (বড় জামরার) নিকট পৌঁছে বায়তুল্লাহকে বামে আর মিনাকে ডানে রেখে সাতটি কঙ্কর মারলেন। এতে প্রত্যেকবার 'আল্লাহু আকবার' বলেছেন। অতঃপর তিনি বললেন, যাঁর উপর সূরা আল-বাক্বারা নাযিল হয়েছে, তিনিও ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে পাথর মেরেছেন।[১] ১০ তারিখের কাজগুলো আগ-পিছ হলে কোনো দোষ নেই।[২]

যা করা নিষেধ :

(১) আরাফা হতে মুযদালিফায় দৌড়ঝাঁপ করে আসা।

(২) মুযদালিফায় রাত যাপনের জন্য বিশেষ গোসল করা।

(৩) মুযদালিফায় বিশেষ দু'আ ও ওয়াযীফা পাঠ করা।

(৪) মুযদালিফায় পৌঁছে ছালাত আদায় না করে তাড়াহুড়া করে পাথর সংগ্রহ করা।

(৫) মাগরিব ও এশার সুন্নাত এবং বিতর পড়া।

(৬) মুযদালিফার রাতে না ঘুমিয়ে জেগে ইবাদত করা বা গল্পগুজব করা।

যিলহজ্জের ১০ তারিখের দ্বিতীয় কাজ : ১০ তরিখের দ্বিতীয় কাজ হলো হাদী যবেহ করা। হাদীর জন্য উত্তম হলো উট। তারপর গরু, তারপর ছাগল বা দুম্বা অথবা উট বা গরুর সাত ভাগের এক ভাগ। হাদীর বয়স ও বৈশিষ্ট্য কুরবানীর পশুর মতোই হতে হবে।[৩] হাদী একাধিক হতে পারে। যেমন- নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদী ছিল ১০০টি উট। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে ৬৩টি যবেহ করেছিলেন আর বাকিগুলো আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু যবেহ করেছিলেন।[৪] পশু যবেহর স্থান সম্পর্কে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'সম্পূর্ণ মিনা পশু যবেহর স্থান। আর মক্কার প্রতিটি পথ চলাচল এবং পশু যবেহর স্থান। অতএব তোমরা তোমাদের বাড়ি-ঘরে কুরবানী করতে পার বা পশু যবেহ করতে পার। হাদী ও কুরবানী যবেহর সময় মোট চার দিন। তা হলো, ১০, ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ 'আইয়ামে তাশরীকের ১১, ১২ ও ১৩ এর প্রতিটি দিনই হাদী যবেহ করার দিন'।[৫] অতএব এ চার দিনের যেকোনো সময় হাদী করতে পারে। আর সুন্নাত হচ্ছে কুরবানীদাতা নিজ হাতে কুরবানী করবে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে কুরবানী করেন।[৬] যদি না হয়, তাহলে অন্য কাউকে প্রতিনিধি বানাবে।[৭] কেবলামুখী করে বাম কাতে ফেলে যবেহ করা সুন্নাত। কেবলামুখী ছাড়া যবেহ করলে আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা সেটা খাওয়া অপছন্দ করতেন।[৮] আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ 'আল্লাহর নামে যবেহ করছি। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে, তার পরিবারের পক্ষ থেকে ও তার উম্মতের পক্ষ থেকে কবুল করো'।[৯]

যদি কোনো ব্যক্তি অর্থের অভাবে কুরবানী দিতে না পারে, তাহলে হজ্জের সময় তিন দিন এবং বাড়িতে ফিরে সাত দিন মোট ১০ দিন ছিয়াম পালন করবেন। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ 'যে ব্যক্তি হজ্জের সাথে উমরাকে মিলিয়ে উপকার লাভ করতে চায়, সে যেমন সম্ভব কুরবানী দিবে। কিন্তু

১. ছহীহ বুখারী, হা/১৭৪৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১২৯৬; মিশকাত, হা/২৬২১।
২. ছহীহ বুখারী, হা/৮৩; ছহীহ মুসলিম, হা/১৩০৬; মিশকাত, হা/২৬৫৫, ২৬৫৬।
৩. আলবানী, মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা, পৃ. ৩৫।
৪. ছহীহ মুসলিম, হা/১২১৮।
৫. আহমাদ, হা/১৬৭৫৭; সিলসিলা ছহীহা, হা/২৪৭৬।
৬. ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৬৭; মিশকাত, হা/১৪৫৪।
৭. ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৬৭; মিশকাত, হা/১৪৫৪।
৮. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হা/৮৬১৬।
৯. ছহীহ মুসলিম, হা/২৪৪৯১; মিশকাত, হা/১৪৫৪।

কেউ যদি তা না পায়, তাহলে সে হজ্জের দিনগুলোতে তিন দিন এবং বাড়ি ফেরার পর সাত দিন মোট ১০ দিন ছিয়াম থাকবে' *(আল-বাক্বারা, ২/১৯৬)*।

জরুরী কথা, হজ্জের দিনগুলোতে যারা ছিয়াম থাকবে, তারা ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে ছিয়াম রাখতে পারে- যদিও এ দিনগুলোতে ছিয়াম রাখা নিষেধ। হজ্জের দিনগুলোতে শুধু তারা ছিয়াম থাকবে, যারা কুরবানীর ব্যবস্থা করতে পারেনি *(আল-বাক্বারা, ২/১৯৬)*।

১০ তারিখের তৃতীয় কাজ হলো, মাথা ন্যাড়া করা বা চুল ছোট করা। ১০ তারিখের চতুর্থ কাজ হলো, তাওয়াফে ইফাযা বা তাওয়াফে যিয়ারাহ করা। এটা মূলত হজ্জের রুকন। এ তাওয়াফে ইযত্বেবা এবং রমল নেই। শুধু কা'বায় সাত চক্কর তাওয়াফ এবং দুই রাকআত ছালাত। অতঃপর যমযমের পানি পান করবে। এ তাওয়াফের মাধ্যমে ইহরামের সব নিষিদ্ধ বিষয় হালাল হয়ে যাবে। ১০ তারিখের ৫ম কাজ হলো ছাফা ও মারওয়ায় সাঈ করা। মূলত এটা তামাত্তু হজ্জের জন্য। আর যারা ক্বিরান বা ইফরাদ হজ্জ করবে, তারা তাওয়াফে কুদূমের সময় সাঈ করলে ১০ তারিখে সাঈ করতে হবে না। আর না করলে ১০ তারিখে তাওয়াফের পর সাঈ করতে হবে। কারণ তামাত্তু হজ্জের জন্য দুটি সাঈ এবং ক্বিরান ও ইফরাদের জন্য একটি সাঈ। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, যারা শুধু উমরার ইহরাম বেধেছে, তামাত্তু হজ্জের জন্য তারা কা'বায় তাওয়াফ এবং ছাফা-মারওয়ায় সাঈ করার পর হালাল হয়ে যাবে। অতঃপর মিনায় হজ্জের কাজ শেষ করে এসে পুনরায় তাওয়াফ এবং ছাফা-মারওয়া সাঈ করবে। আর যারা হজ্জ এবং উমরার এক সাথে ইহরাম বেঁধেছে, তারা শুধু একবার তাওয়াফ করবে এবং একবার ছাফা-মারওয়ায় সাঈ করবে।[১০] এভাবেই ১০ তারিখের কাজ শেষ হবে।

যা বর্জনীয় :

(১) পাথর মারার জন্য বিশেষ কোনো গোসল করা।

(২) পাথর মারার জন্য হাত ধৌত করা।

(৩) পাথর মারার সময় 'আল্লাহু আকবার' ছাড়া অন্য কোনো দু'আ পড়া।

(৪) শয়তানকে গালিগালাজ করা এবং জুতা ছুড়ে মারা।

(৫) হাদী বা কুরবানী না করে মূল্য ছাদাক্বা করা।

(৬) ১০ তারিখের পূর্বে হাদী যবেহ করা।

(৭) মাথার চুল কিছু অংশ কাটা বা ন্যাড়া করা।

(৮) হজ্জের কাজ মনে করে মিনায় ঈদের ছালাত আদায় করা।

১১, ১২ ও ১৩ তারিখ মিনায় রাত্রিযাপন : ১০ তারিখ দিন পার হলে হবে ১১ তারিখের রাত। তারপর হবে ১২ ও ১৩ তারিখের রাত। এ তিন রাত মিনায় রাতযাপন করা উচিত। তবে এ তিন রাতের মধ্যে ১১ ও ১২ রাতযাপন করেও চলে আসতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ 'আর নির্ধারিত দিনসমূহে আল্লাহকে স্মরণ করো। অতঃপর কেউ যদি দু'দিনের মধ্যে (মক্কায় ফিরে যেতে) তাড়াতাড়ি করে, তবে তার জন্য কোনো পাপ নেই। পক্ষান্তরে কেউ যদি বিলম্ব করে, তবে তার জন্যও পাপ নেই এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো ও জেনে রেখো যে, অবশ্যই তোমাদের সকলকে তাঁরই নিকট সমবেত করা হবে' *(আল-বাক্বারা, ২/২০৩)*। যদি কেউ ১২ তারিখে চলে আসতে চায়, তাকে ১২ তারিখ সূর্য ডুবার আগেই মিনা ত্যাগ করতে হবে। ১২ তারিখ সূর্য ডুবে গেলে ১৩ তারিখ বিকালে পাথর মেরেই আসতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, مَنْ غَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ مِنْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَهُوَ بِمِنًى، لا يَنْفِرَنَّ حَتَّى يَرْمِيَ الْجِمَارَ مِنَ الْغَدِ 'তাশরীকের মধ্যদিনে অর্থাৎ ১২ তারিখে যার মিনায় সূর্য ডুবে যাবে, সে যেন পরের দিন ১৩ তারিখে পাথর মারার পূর্বে মিনা ত্যাগ না করে'।[১১] অতএব তিন রাত থাকা এবং তিন দিন পাথর মারা সবচেয়ে ভালো।

(চলবে)

১০. ছহীহ বুখারী, হা/১৫৭২।

১১. মুওয়াত্ত্বা মালেক, হা/৫১১; আলবানী, মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা পৃ. ৩৮।

সূরা আন-নাবা : মানবজাতির জন্য হাদিয়া

-হাফেয আব্দুল মতীন মাদানী*

(পর্ব-৬)

(৬) নির্ধারিত বিচার দিবস : প্রত্যেকটি বিষয় নির্ধারিত। মানুষকে নির্ধারিত সময় ছালাত আদায় করতে হয়, নির্ধারিত পরিমাণ মাল হতে যাকাত দিতে হয়, হজ্জ ফরয হলে নির্ধারিত সময়ে হজ্জ আদায় করতে হয়, নির্ধারিত সময়ে ছিয়াম পালন করতে হয়, নির্ধারিত সময়ে মানুষের মৃত্যু হয়; একটু আগেও না, পরেও না। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ ‘প্রত্যেক জাতির জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। সুতরাং যখন সেই নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হবে তখন তা এক মুহূর্ত আগেও হবে না এবং পরেও হবে না’ *(ইউনুস, ১০/৪৯)*। মানুষ এভাবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দুনিয়াতে আসে। তার সময়সীমা শেষ হলে তাকে দুনিয়া ছেড়ে পরকালে চলে যেতে হয় এবং নির্ধারিত সময়ে বিচার ফয়সালা হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا﴾ ‘নিশ্চয়ই বিচারদিবস সুনির্ধারিত রয়েছে’ *(আন-নাবা, ৭৮/১৭)*। মহান আল্লাহ বিচার-ফয়সালা করবেন। যারা পরকালকে অবিশ্বাস করত, তাদেরসহ সকল সৃষ্টির ভালো-মন্দের ফয়সালা করা হবে। এদিন খুব কঠিন ও জটিল। মহান আল্লাহ যেন আমাদেরকে রক্ষা করেন- আমীন!

সুতরাং মানবজাতির শিক্ষার শুরু হলো— তুমি আল্লাহর নামে পড়ো। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ - خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ - الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ ‘তুমি পড়ো তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। পড়ো তোমার মহামহিমান্বিত প্রতিপালকের নামে, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষাদান করেছেন। তিনি শিক্ষাদান করেছেন মানুষকে (এমন জ্ঞান), যা সে জানত না’ *(আল-আলাক্ব, ৯৬/১-৫)*।

মানবজাতি যদি তার জীবনটা আল্লাহমুখী করত, তাহলে আদর্শবান হয়ে সমাজের খেদমত করতে পারত। নৈতিক শিক্ষাই হচ্ছে প্রথমে আল্লাহর সম্পর্কে জানা। মানুষ যত আল্লাহকে চিনবে, তত বেশি আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারবে। এজন্যই সর্বপ্রথম সন্তানদের নৈতিক শিক্ষা দিতে হবে। আল্লাহর কালাম নিজে পড়ুন, আপনার সন্তানসন্ততিকে পড়ান। ছালাত নিজে পড়ুন, আপনার সন্তানসন্ততিকেও ছালাত পড়ান। ভালো কাজ নিজে করুন, আপনার সন্তানসন্ততিকে করান। তাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে শিক্ষা দিন এবং আরো শিক্ষা দিন যে, কোনোকিছুতেই আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করা যাবে না। সকল ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যই করতে হবে। এভাবেই কল্যাণ হবে ইনশাআল্লাহ। মা-বোন নিজে পর্দা করবে এবং মেয়েদের পর্দা করা শিক্ষা দিবে। হালাল-হারাম ও অন্যায় অপকর্ম বিষয়ে তাদেরকে ধারণা দিবে, যাতে তা থেকে তারা দূরে থাকতে পারে। মৃত্যুর পর বিচারদিবসে আপনাকে আবার বলা হবে, পড়ো। আপনার জীবনে যা করেছেন সব লিপিবদ্ধ রয়েছে; অস্বীকার করার কোনো ক্ষমতা থাকবে না। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا - اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ ‘প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্ম আমি তার গলায় লাগিয়ে দিয়েছি এবং ক্বিয়ামতের দিন আমি তার জন্য বের করব এক কিতাব, যা সে উম্মুক্ত পাবে। (আমি বলব) তুমি তোমার আমলনামা পাঠ করো, আজ তুমিই তোমার নিজের হিসাব-নিকাশের জন্য যথেষ্ট’ *(বানু ইসরাঈল, ১৭/১৩-১৪)*। মহান আল্লাহ বলেন, ‘(স্মরণ করো, সেদিনের কথা) যেদিন আমি পর্বতকে সঞ্চালিত করব আর তুমি পৃথিবীকে দেখবে একটি শূন্য প্রান্তর, সেদিন তাদেরকে (মানুষকে) আমি একত্রিত করব এবং তাদের কাউকে অব্যাহতি দিব না। আর তাদেরকে তোমার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত করা হবে সারিবদ্ধভাবে এবং বলা হবে, তোমাদেরকে প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবেই তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হয়েছ। অথচ তোমরা মনে করতে যে, তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত সময় আমি উপস্থিত করব না? আর সেদিন উপস্থিত করা হবে আমলনামা আর তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে, তার কারণে তুমি অপরাধীদের দেখবে আতঙ্কগ্রস্ত এবং তারা বলবে, হায় দুর্ভোগ আমাদের! এটা কেমন গ্রন্থ! ওটা তো ছোট-বড় কিছুই বাদ দেয়নি এবং ওটা সমস্ত হিসাব রেখেছে। তারা তাদের কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত পাবে। তোমার প্রতিপালক কারো প্রতি যুলুম করে না’ *(আল-কাহফ, ১৮/৪৭-৪৯)*। মহান আল্লাহ বলেন, ‘কিন্তু যার আমলনামা তার বাম হাতে দেওয়া হবে, সে বলবে, হায়! আমাকে যদি আমার আমলনামা না দেওয়া হতো। আর আমি যদি আমার হিসাব কী, তা না জানতাম। হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হতো! আমার ধনসম্পদ আমার কোনো কাজে আসলো না। আমার ক্ষমতাও বিনাশ হয়েছে। (বলা হবে), তাকে ধরো। অতঃপর তার গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো। পুনরায় তাকে বেঁধে ফেলো এমন শিকল দ্বারা, যার মাপ ৭০ হাত লম্বা। নিশ্চয় সে মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করত না এবং অভাবগ্রস্তদের খাদ্য দানে উৎসাহিত করত না। অতএব,

* পি.এইচ.ডি গবেষক, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, মালয়েশিয়া।

এই দিন সেখানে তার কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকবে না এবং কোনো খাদ্য থাকবে না রক্ত ও পুঁজ ব্যতীত। যা শুধু অপরাধীরাই ভক্ষণ করবে' *(আল-হাক্কাহ, ৬৯/২৫-৩৭)*। সেদিন মানুষ তার ভালোমন্দ সবই দেখতে পাবে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ - وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ 'যে কেউ অণু পরিমাণ সৎ আমল করবে, তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করে, তাও দেখবে' *(আল-যিলযাল, ৯৯/৭-৮)*।

হে নাস্তিক! হে বস্তুবাদী! হে অহংকারী! যারা পরকালে অবিশ্বাস কর, বিচার দিবসকে অবিশ্বাস কর, নেতা হয়েছ বলে মানুষকে পথভ্রষ্ট কর, ভালো করে শোনো, হে পীর সাহেব ও মুরিদান ভালো করে শোনো, মহান আল্লাহ বলেন, '(কাফেররা বলে) আমরা যখন মারা যাব এবং মাটি ও হাড্ডিতে পরিণত হব, তখনো কি আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে এবং আমাদের পূর্বপুরষদেরও? বলো, হ্যাঁ এবং তোমরা লাঞ্ছিত হবে। ওটা একটি মাত্র প্রচণ্ড শব্দ, আর তখনই তারা প্রত্যক্ষ করবে এবং তারা বলবে, হায়! দুর্ভোগ আমাদের! এটাই তো কর্মফল দিবস। এটাই ফয়সালার দিন, যা তোমরা অস্বীকার করতে'। (ফেরেশতাদেরকে বলা হবে) একত্রিত করো যালেম ও তাদের সহচরদেরকে এবং তাদেরকে, যাদের তারা ইবাদত করত। আল্লাহর পরিবর্তে এবং তাদের হাঁকিয়ে নিয়ে যাও জাহান্নামের পথে। অতঃপর তাদেরকে থামাও, কারণ তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে, তোমাদের কী হলো যে, তোমরা একে অন্যের সাহায্য করছ না? বস্তুত সেদিন তারা আত্মসমর্পণ করবে। আর তারা একে অপরের সামনাসামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তারা বলবে, তোমরা তো (শক্তি প্রয়োগ করে পথভ্রষ্ট করতে) ডান দিক থেকে আমাদের নিকট আসতে। তারা বলবে, তোমরা তো বিশ্বাসীই ছিলে না। আর তোমাদের উপর আমাদের তো কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। বস্তুত তোমরা ছিলে সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়। আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিপালকের কথা সত্য হয়েছে, আমাদেরকে অবশ্যই শাস্তি আস্বাদন করতে হবে। আমরা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম, কারণ আমরা নিজেরাও বিভ্রান্ত ছিলাম। তারা সবাই সেই দিন আযাবে শরীক হবে। অপরাধীদের প্রতি আমি এরূপই করে থাকি' *(আছ-ছফফাত, ৩৭/১৬-৩৪)*।

হে মানবজাতি! যারা কবরপূজা, মানুষের অন্ধ অনুসরণ, বিদআত, অন্যায় অপকর্ম নিয়ে ব্যস্ত, শয়তানের সহচর, কুরআন-সুন্নাহ থেকে বিমুখ, তারা শুনো আল্লাহর কথা। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ - وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ -حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ - وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ 'যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ হয়, আমরা তার জন্য নিয়োজিত করি এক শয়তান, অতঃপর সেই হয় তার সহচর। তারাই (শয়তানরাই) মানুষকে সৎপথ হতে বিরত রাখে, অথচ মানুষ মনে করে যে, তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত। অবশেষে যখন সে আমাদের নিকটে উপস্থিত হবে, তখন সে (শয়তানকে) বলবে, হায়! আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান থাকত! কতই না নিকৃষ্ট সহচর সে। আর আজ এ অনুতাপ তোমাদের কোনোই উপকারে আসবে না, যেহেতু তোমরা যুলুম করেছিলে। তোমরা তো সবাই শাস্তিতে শরীক হবেই' *(আল-যুখরুফ, ৪৩/৩৬-৩৯)*। হে মানবজাতি! বিচারের মাঠ খুবই ভয়াবহ, কেউ সেখান থেকে রেহাই পাবে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'যেদিন আল্লাহর শত্রুদেরকে জাহান্নাম অভিমুখে সমবেত করা হবে, সেদিন তাদেরকে বিন্যস্ত করা হবে বিভিন্ন দলে। পরিশেষে যখন তারা জাহান্নামের সন্নিকটে পৌঁছবে, তখন তাদের কর্ণ, চক্ষু ও চামড়া তাদের বিরুদ্ধে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে। জাহান্নামীরা তাদের ত্বককে জিজ্ঞেস করবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ কেন? উত্তরে তারা বলবে, আল্লাহ, যিনি সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন প্রথমবার এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যবর্তিত হবে। তোমরা কিছু গোপন করতে না এ বিশ্বাসে যে, তোমাদের কর্ণ, চক্ষু এবং ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে না। উপরন্তু তোমরা মনে করতে যে, তোমরা যা করতে, তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না। তোমাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদের এই ধারণাই তোমাদের ধ্বংস এনেছে। ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ' *(হা-মীম আস-সাজদাহ, ৪১/১৯-২৩)*।

হে মানবজাতি! আজ তোমার কর্ম করার সময়, আগামীকাল কিয়ামত, সেদিন কোনো কর্ম করার সুযোগ নেই, এটা পরীক্ষার স্থান। তাই এই পরীক্ষাতে কৃতকার্য হয়ে নাজাতের নৌকাতে আরোহন করার চেষ্টা করো। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে ধ্বংসের নৌকায় আরোহন করতে হবে। সেদিন কোনো পথ থাকবে না। খুব ভালো করে শোনো! মহান আল্লাহ বলেন, 'যেদিন তারা (কবর হতে) বের হয়ে পড়বে, সে দিন আল্লাহর নিকট তাদের কিছুই গোপন থাকবে না। (আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন) আজ কর্তৃত্ব কার? এক পরাক্রমশালী আল্লাহরই। আজ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের বিনিময় দেওয়া হবে। আজ কারো প্রতি কোনো যুলুম করা হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। ওদেরকে আসন্ন দিন সম্পর্কে সতর্ক করে দিন, যখন দুঃখে-কষ্টে ওদের হৃদয় কণ্ঠাগত হবে। আর যালেমদের জন্য কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই এবং সুপারিশকারীও নেই, যার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। চক্ষুর অপব্যবহার ও অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত। একমাত্র ইনছাফের সাথে আল্লাহই ফয়সালা করবেন, আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে, তারা কোনোকিছুর ফয়সালা করতে সক্ষম নয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা' *(আল-মুমিন, ৪০/১৬-২০)*।

(চলবে)

স্কুল-কলেজ ও মাদরাসাশিক্ষার বৈষম্য

-ড. মো. কামরুজ্জামান*

দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১ লাখ ৩৪ হাজার ১৪৭টি। এর মধ্যে সরকারি বিদ্যালয়ের সংখ্যা হলো ৬৫ হাজার ৯০২টি। এ সমস্ত সরকারি স্কুলের শিক্ষার্থীরা সকলেই সরকারি সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্ত। এর বিপরীতে বাংলাদেশে ইবতেদায়ী মাদরাসার সংখ্যা মাত্র ১৪ হাজার ৯৮৭টি। যার মধ্যে একটি মাদরাসাও সরকারি নয়। এসকল মাদরাসার শিক্ষার্থীরা সরকারি কোনো সুযোগ-সুবিধাই পায় না। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে। মেধার ভিত্তিতে এসব স্কুল শিক্ষার্থীদের বৃত্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। বিপরীতে ইবতেদায়ী মাদরাসার শিক্ষার্থীদের জন্য এরকম কোনো ব্যবস্থা নেই। এ জাতীয় বিভিন্ন সুবিধাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে তারা শূন্যের কোঠায় রয়ে গেছে। অথচ মাদরাসার অধিকাংশ শিক্ষার্থী দরিদ্র পরিবারের সন্তান!

সরকারি এক হিসেব মতে, এত কিছুর পরেও সরকারি প্রাইমারি থেকে প্রতিবছর ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫২ থেকে ৫৫ শতাংশ। অন্যদিকে ইবতেদায়ী মাদরাসা থেকে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪০ থেকে ৪২ শতাংশ।[১] স্কুল ও কলেজ শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে সরকারি ব্যাপক সুযোগ-সুবিধা। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় তাদের জন্য গড়ে উঠেছে ডিবেটিং সোসাইটি ও ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব। গড়ে উঠেছে নানা সাংস্কৃতিক কেন্দ্রসহ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। তাদের জন্য রয়েছে বিনোদনের বিভিন্ন অনুষঙ্গ। কিন্তু মাদরাসাশিক্ষার্থীদের জন্য এ জাতীয় কোনো কিছুর ব্যবস্থা রাখা হয়নি। কোনো সেক্টরেই তাদের জন্য এ জাতীয় কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। মাদরাসার এসমস্ত বালক-বালিকা এবং কিশোর-কিশোরিরা বিনোদনের সকল সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তারা মানবিক গুণাবলি বিকাশে ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তারা শুধু রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত কিছু অনুষ্ঠান পালনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সকল প্রতিষ্ঠানে আবার এ অনুষ্ঠান পালিত হয় না। গুটিকয়েক মাদরাসা রাষ্ট্রীয় কিছু অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। সেটাও আবার নিয়ম রক্ষা ও লোক দেখানোর জন্য।

মাদরাসাগুলো সবচেয়ে বঞ্চিত হচ্ছে জাতীয়করণের ক্ষেত্রে। প্রতিটি সরকার তার সময়কালে দেশের স্কুল এবং কলেজ জাতীয়করণের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। বর্তমান সরকার ২০১৩ সালের ৯ জানুয়ারি ২৬ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেছে। কিন্তু জাতীয়করণের এ তালিকায় কখনোই মাদরাসাকে যুক্ত করা হয়নি। বাংলাদেশে মাত্র তিনটি সরকারি আলিয়া মাদরাসা রয়েছে। এর প্রথমটি হলো মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকা। এ মাদরাসাটি বাংলাদেশের কোনো সরকার প্রতিষ্ঠা করেনি। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৮০ সালে। ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক কলকাতায় এটা প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদরাসাটি পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। দ্বিতীয় সরকারি আলিয়া মাদরাসাটি হলো সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসা। এটিও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নয়। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রিটিশ আমলে তথা ১৯১৩ সালে। তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী খান বাহাদুর সৈয়দ আব্দুল মজিদ সরকারি উদ্যোগে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। তৃতীয় সরকারি আলিয়া মাদরাসাটি হলো সরকারি মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদরাসা, বগুড়া। এটাও প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৫ সালে অর্থাৎ ব্রিটিশ পিরিয়ডে। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেব আবূ বকর ছিদ্দীক্ব রাহিমাহুল্লাহ। ১৯৮৬ সালে প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মাদ এরশাদ এটাকে সরকারিকরণ করেন।

মাউশির তথ্য অনুযায়ী দেশে বর্তমানে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬৬২টি। ২০১০ সালের আগে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল ৩৪৮টি। তার মানে গত ১২ বছরে দেশে ৩১৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সরকারি হয়েছে। সর্বশেষ ২০১৮ সালের ১২ আগস্ট ২৭১টি কলেজকে সরকার সরকারি ঘোষণা করেছে। উল্লেখিত বর্ণনা এটাই প্রমাণ করে যে, বর্তমান সরকার শিক্ষাবান্ধব সরকার। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক সত্য হলো, দেশে মাদরাসাশিক্ষা উপেক্ষিত রয়ে গেছে। অথচ দেশে ইবতেদায়ী, দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল মাদরাসার শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় ৩০ লাখ। এ বিশাল শিশু ও যুবশক্তি সরাসরি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত। এছাড়া দেশে ক্বওমী মাদরাসার সংখ্যা ১৪ হাজারের মতো। আর শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় ১৪ লাখ। এ বিশাল জনশক্তি একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে সক্ষম। ইতোপূর্বে মাদরাসাশিক্ষার্থীরা দেশের শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছেন। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক উন্নয়নেও তাদের অবদান উল্লেখ করার মতো। স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীর পাশাপাশি তারাও দেশ গড়ায় অনন্য ভূমিকা রেখেছেন। উদাহরণ হিসেবে আমরা নবাব আব্দুল লতিফের কথা উল্লেখ করতে পারি। বাংলার বিখ্যাত এ নবাব ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারী থানার শ্রেষ্ঠ সন্তান হিসেবে পরিচিত। তিনি ছিলেন ঢাকা আলিয়া

* অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

১. shikhabarta.com, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২১।

মাদরাসার ছাত্র। কর্মজীবনে রয়েছে তার অভূতপূর্ব অবদান। ১৮৪৯ সালে তিনি ব্রিটিশ ভারতের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৮৭৭ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট পদে প্রমোশন পান। ১৮৬২ সালে তিনি বঙ্গীয় আইন পরিষদের সর্বপ্রথম মুসলিম সদস্য হিসেবে মনোনীত হন। ১৮৬৩ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো মনোনীত হন। একই সালে তিনি কলকাতা মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি গঠন করেন। তার প্রচেষ্টাতে কলকাতা মাদরাসায় ফার্সী এবং বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। তারই নেতৃত্বে হাজী মুহাম্মাদ মহসিন ফান্ডের টাকা মুসলিম সন্তানদের শিক্ষা খাতে ব্যয় করা হয়। তিনি 'আলিগড় বৈজ্ঞানি 'ক' সোসাইটি'-এর সদস্য ছিলেন। উল্লেখ্য, তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সহপাঠী ছিলেন। তার অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৮৮০ সালে ইংরেজরা তাকে নবাব উপাধিতে ভূষিত করেন। পরবর্তীতে তিনি নবাব বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হন। ঢাকা আলিয়ার আরেকজন উল্লেখযোগ্য শিক্ষার্থী হলেন সৈয়দ আমীর আলী। তিনি উড়িষ্যার কটক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকালে তিনি কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় (যেটা পরবর্তীতে ঢাকা আলিয়ায় রূপান্তরিত হয়) ভর্তি হন। তিনি আরবী ভাষা ও ব্যাকরণে যথেষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। ১৮৭৩ সাল থেকে ১৮৭৮ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে মুসলিম আইনের অধ্যাপক ছিলেন। ১৮৭৮-১৮৮১ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতার চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ১৮৮৪ সালে তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের ঠাকুর আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৯০ সালে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম মুসলিম বিচারপতি নিযুক্ত হন। অর্থাৎ ব্রিটিশ আমলে মাদরাসাশিক্ষা আর কলেজ শিক্ষার মধ্যে কোনো বৈষম্য ছিল না।

ঢাকা আলিয়ার অন্য একজন উল্লেখযোগ্য শিক্ষার্থী হলেন মুহাম্মাদ ফখরুদ্দীন। তিনি ১৯৬৩ সালে ঢাকা আলিয়ায় কামিল হাদীছ বিভাগে ভর্তি হন। তিনি একই মাদরাসায় প্রভাষক এবং উপাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শায়খুল হাদীছ। তিনি সিলেট সরকারি আলিয়ার ২৬তম অধ্যক্ষ ছিলেন। ২০০০ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এ দায়িত্ব পালন করেন। প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব পালনে তার সততা ও যোগ্যতা ছিল উল্লেখ করার মতো। আর একজন মাদরাসার শিক্ষার্থীর নাম আমরা গর্বের সাথে উল্লেখ করতে পারি। তিনি হলেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও সিলেটের কৃতি সন্তান জনাব হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী। তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের সিলেট জেলায় ১৯২৮ সালে তার জন্ম। তার শিক্ষাজীবন শুরু হয় সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসায়। তিনি এ মাদরাসায় হাই সেকশনে ভর্তি হয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। তিনি বাংলা, ইংরেজি, উর্দূ ও অন্যান্য ভাষার পাশাপাশি আরবী ভাষাতেও দক্ষ ছিলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদান রেখেছিলেন। ২০১৮ সালে তাকে স্বাধীনতা পদক প্রদান করা হয়। তিনি ছিলেন দেশের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও সংসদ সদস্য। ১৯৯৬ সালের ১৪ জুলাই তিনি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পিকার নির্বাচিত হন। ২০০১ সালে মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত তিনি এ পদে বহাল ছিলেন। এছাড়া সিলেট আলিয়া মাদরাসার উল্লেখযোগ্য আরো কয়েকজন ছাত্র হলেন- আবূ সাঈদ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ। তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, সৈয়দ লোকমান হোসেন, তিনি ঢাকা জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক হিসেবে সফলভাবে দায়িত্ব পালন করেন। একই মাদরাসার ছাত্র ফরীদ উদ্দীন চৌধুরী একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সাবেক সংসদ সদস্য।

উক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, অতীতে মাদরাসার শিক্ষার্থীরা দেশ ও জাতি গড়ায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন। তারা দেশ ও জাতির আর্থসামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রেখেছেন। কিন্তু বর্তমানে এ শিক্ষাব্যবস্থাকে দুঃখজনকভাবে অবহেলা করা হচ্ছে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় একজন ছাত্রও পাশ করেনি এমন কলেজকে সরকার জাতীয়করণ করেছে। অথচ দেশের নামকরা অসংখ্য মাদরাসা আছে, যে সমস্ত মাদরাসার পাশের হার শতভাগ। এ মাদরাসাগুলো শুধু শতভাগ পাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এ মাদরাসাসমূহের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ জাতীয় বিভিন্ন ইস্যুতে সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে চলেছেন। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি পরীক্ষায় মাদরাসার শিক্ষার্থীরা আকাশচুম্বী সাফল্য দেখাচ্ছেন। তারপরও এসমস্ত মাদরাসার নাম জাতীয়করণের তালিকাভুক্ত হয়নি। ফলে মাদরাসাসমূহের গরীব শিক্ষার্থীরা যুগের পর যুগ বঞ্চিতই থেকে যাচ্ছে। মেধার স্বাক্ষর রেখেও তারা সরকারি কোনো পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছেন না। মাসিক বিভিন্ন হারে বেতন দিয়ে তাদেরকে লেখাপড়া চালাতে হচ্ছে। এসমস্ত গরীব শিক্ষার্থী মাসে সর্বনিম্ন ১০০ টাকা থেকে ৩০০ টাকা বেতন দিয়ে লেখাপড়া করছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ বেতন ৩০০ থেকে ৫০০ পর্যন্ত প্রবৃদ্ধি হচ্ছে। অন্যদিকে স্কুল-কলেজের চিত্র সম্পূর্ণ উলটা। সেখানে একদিকে সচ্ছল পরিবারের সন্তানরা লেখাপড়া করছে। আর জাতীয়করণের সুবিধা পেয়ে তারা মাসিক মাত্র ৭ টাকা হারে বেতন দিচ্ছে। মিড ডে মিল ও উপবৃত্তি উপভোগ করছে। ফ্রি ড্রেসসহ সরকারি অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা লাভ করছে।

বাংলাদেশের মোট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শতকরা ২৫ ভাগ হলো এমপিওভুক্ত মাদরাসা। এরপরও এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা আজ চার দেয়ালের মধ্যে বন্দি। সরকারি চাকরি তাদের জন্য দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারি

চাকরিতে তাদের বিরুদ্ধে অঘোষিত নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। দেশের সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান ১০ শতাংশের নিচে। এ ১০ শতাংশের একজনও আবার পূর্ণাঙ্গভাবে মাদরাসার ছাত্র নয়। এদের সকলেই অনার্স ও মাস্টার্স করেছে কোনো না কোনো কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। অর্থাৎ সরকারি চাকরিরত এসব মাদরাসার শিক্ষার্থী হাফ মাদরাসা ও হাফ কলেজে পড়ুয়া। তাদের অর্ধেক সার্টিফিকেট মাদরাসার আর বাকি অর্ধেক কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের। দাখিল এবং আলিম পাশ করে তারা অনার্স ও মাস্টার্স করেছে কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে। আর এই অনার্স এবং মাস্টার্স দিয়েই তারা চাকরি করছে সরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানে। অর্থাৎ সরকারি চাকরি পাওয়ার আশায় তারা মাদরাসাকে বাদ দিয়ে ছুটছে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। এতে ফাযিল এবং কামিল মাদরাসাসমূহ মেধাশূন্য হয়ে পড়েছে। এর অর্থ দাঁড়ায় মাদরাসায় উচ্চশিক্ষা থাকা সত্ত্বেও শুধু সরকারি চাকরির আশায় তারা ছুটছে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। এতে স্পষ্টতই বলা যায় যে, মাদরাসাসমূহের উচ্চশিক্ষা লোক দেখানো মাত্র। এখানে গুণের এবং মানের কোনো পৃষ্ঠপোষকতা নেই। মূলত উচ্চশিক্ষা বলতে জ্ঞানের সৃজনশীলতা ও গবেষণাকে বুঝায়। প্রেষণা ও উন্নত প্রশিক্ষণও উচ্চশিক্ষার অন্যতম উপাদান ও অনুষঙ্গ। আর এ প্রেষণা ও প্রশিক্ষণ জ্ঞানের সীমারেখাকে বিস্তৃত করে। উন্নত প্রশিক্ষণ একজন শিক্ষার্থীকে উদ্ভাবক ও বিশ্লেষক তৈরিতে সহায়তা করে। জ্ঞানের এ বিস্তৃত ধারা মোটামুটিভাবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজে চালু আছে। কিন্তু মাদরাসাসমূহে এগুলোর কোনো অস্তিত্ব নেই। এখানে স্কুল-কলেজের মতো পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ নেই। প্রেষণার ধারণা নেই, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম নেই। নেই উন্নত গবেষণাজার্নাল ও শিক্ষাছুটির কোনো ব্যবস্থা। নেই কোনো উন্নত অবকাঠামোগত ব্যবস্থাপনা। বিজ্ঞান বিভাগ থাকলেও সেখানে বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামাদি নেই। ২১৫টি কামিল মাদরাসার মধ্যে ৮২-তে অনার্স কোর্স চালু আছে। তাও শুধু কুরআন, হাদীছ, দাওয়াহ এবং ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে অনার্স আছে। আবার এ সমস্ত বিষয়ে অনার্স-মাস্টার্স কমপ্লিট করে মাদরাসার প্রশাসনিক পদে চাকরি করার সুযোগ তাদের নেই। যা মাদরাসার জনবল কাঠামোতে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। এটা মাদরাসাশিক্ষার সাথে মারাত্মক বৈষম্যমূলক অচরণ।[২] অথচ এ আদেশটি বাংলাদেশ সংবিধানের ২৮(১), ২৮(৩), ২৯(১) ও ২৯(২) ধারার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কুরআন, হাদীছ, দাওয়াহ এবং ইসলামের ইতিহাসের বাইরে মাদরাসাগুলোতে অনার্স কোর্স নেই। অর্থাৎ যুগোপযোগী অন্য কোনো বিষয়ে অনার্স কোর্স মাদরাসাগুলোতে পড়ানো হয় না।

মাদরাসার কামিল ডিগ্রিকে মাস্টার্সের মান দেওয়া হলেও তারা কলেজের ইসলামী শিক্ষার প্রভাষক হতে পারেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করার কথা তো তারা ভাবতেই পারেন না। আবার মাদরাসার প্রশাসনিক পদে চাকরির যোগ্যতায় তারা নিষিদ্ধ। সরকারি প্রশাসনের উঁচু স্তরে আবেদনের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। এটা মাদরাসার সাথে এক ধরনের প্রহসন ছাড়া অন্য কিছু নয়। বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে মাদরাসাশিক্ষা একেবারেই বঞ্চিত। ডয়চে ভেলের তথ্যানুযায়ী দেশে দাখিল মাদরাসার সংখ্যা ৯,২২১টি। আলিম মাদরাসা ২,৬৮৮টি। ফাযিল মাদরাসা ১,৩০০টি। আর কামিল মাদরাসা ১৯৪টি। এগুলো এমপিওভুক্ত এবং সরকারের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত। দেশে প্রতি বছর নিয়ম অনুযায়ী বাজেট ঘোষিত হয়। বছর যায় বছর আসে। প্রতি বছর কম-বেশি বাজেট বৃদ্ধি পায়। কিন্তু মাদরাসার শিক্ষার্থীদের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয় না। এ বছর বাজেট ঘোষণার তারিখ ছিল ১১ জুন ২০২১। এটা ছিল দেশের ৪৯তম বাজেট। দেশে দুই শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ করা হয়ে থাকে। একটি হলো প্রাথমিক ও গণশিক্ষা খাত। আরেকটি হলো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত শিক্ষাখাত। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা খাতে বাজেট ধরা হয়েছে ২৪ হাজার ৯৪০ কোটি টাকা। কিন্তু এখানে ইবতেদায়ী মাদরাসার জন্য কোনো বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়নি। অপরদিকে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা খাতে বাজেট নির্ধারণ করা হয়েছে ৩৩ হাজার ১১৭ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে দাখিল-আলিম তথা মাদরাসার জন্য স্বতন্ত্র কোনো বাজেট নির্ধারণ করা হয়নি। শুধু কারিগরি প্রতিষ্ঠানের সাথে মাদরাসা বিভাগের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৮,৩৪৪ কোটি টাকা। ২০২০-২১ বাজেটে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক খাতে বাজেট বেড়েছে ৫,৪০৭ কোটি টাকা। বিপরীতে মাদরাসার জন্য বাজেট বেড়েছে মাত্র ৮৯৪ কোটি টাকা! সরকার স্বীকৃত ও নিয়ন্ত্রিত একটি শিক্ষা বাজেটের এই হাল সত্যি জাতির জন্য লজ্জার। এটা মাদরাসাশিক্ষার জন্য অত্যন্ত অপমানজনক একটি প্রবৃদ্ধি। এত শত অপমান আর লাঞ্ছনার মাঝেও মাদরাসার শিক্ষার্থীরা ঘুরে দাঁড়িয়েছে বারবার। দেশের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় তাদের রয়েছে ঈর্ষণীয় সাফল্য। সম্প্রতি তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় সেরা সাফল্য অর্জন করেছে। গার্হস্থ্য অর্থনীতিতে ১ম স্থানটি দখল করেছে মাদরাসাশিক্ষার্থী। ঢাবি অধিভুক্ত সাত কলেজের মেধা তালিকায়ও ১ম হয়েছে মাদরাসাশিক্ষার্থী। দেশে ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের গুচ্ছ পরীক্ষায় ১ম হয়েছে মাদরাসার ছাত্র। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ঘ' ইউনিটে ১ম স্থান অধিকার করেছে মাদরাসার শিক্ষার্থী। বুটেক্সে ১ম হয়েছে মাদরাসাশিক্ষার্থী। জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর)-এ প্রথম হয়েছে মাদরাসাশিক্ষার্থী। হাজারো বিপত্তি, বাধা আর বঞ্চিত থাকার পরও মাদরাসাশিক্ষার্থীদের এসব সাফল্য চোখে পড়ার মতো।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

২. সূত্র : আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রবিধান ২০১৯, অনুচ্ছেদ ২.১, পৃ. ৭।

অহির বাস্তবতা বিশ্লেষণ (৪র্থ পর্ব)

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

(ফেব্রুয়ারি'২০ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

(মিন্নাতুল বারী-১১তম পর্ব)

[যে হাদীছের ব্যাখ্যা চলছে : হিশাম ইবনু উরওয়া বলেন, আমাকে হাদীছ শুনিয়েছেন আমার পিতা উরওয়া, তিনি বলেন, আমাকে হাদীছ শুনিয়েছেন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা, তিনি বলেন, হারেছ ইবনু হাশেম রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! কীভাবে আপনার নিকট অহি আসে? তখন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, কখনো অহি আসে ঘণ্টাধ্বনির মতো। আর সেটা আমার জন্য অনেক কষ্টকর হয়। যতক্ষণে তা শেষ হয় ততক্ষণে আমি অহি মুখস্থ করে ফেলি। আর কখনো ফেরেশতা মানুষের রূপ ধারণ করে আসে এবং আমার সাথে কথা বলে এবং আমি তার কথা সংরক্ষণ করে নিই। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি কঠিন শীতে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর অহি অবতীর্ণ হতে দেখেছি; যতক্ষণে অহি শেষ হয় ততক্ষণে তার কপাল থেকে ঘামের কারণে পানি পড়তে থাকে।]

মানুষরূপে ফেরেশতার আগমন : *

প্রথমত, এখানে ফেরেশতা বলতে জিবরীল আলাইহিস সালাম উদ্দেশ্য। কেননা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট অহি নিয়ে অন্য কোনো ফেরেশতা আসেননি; একমাত্র তিনিই এসেছিলেন।

দ্বিতীয়ত, ফেরেশতার মানুষের রূপ ধারণ করা সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের বিভিন্ন মন্তব্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, অতিরিক্ত পাখাগুলো খুলে ফেলে মানুষের রূপ ধারণ করেন।[১] হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তুলা যেমন ফুলে থাকলে অনেক বড় দেখায় আবার চাপ দিলে সংকীর্ণ হয়ে আসে, ঠিক তেমনি ফেরেশতা নিজেকে অনেক সংকীর্ণ করে মানুষের আকৃতিতে আসে।[২] সর্বোপরি কথা হচ্ছে, মহান আল্লাহ তাদের মাঝে সে শক্তি দিয়েছেন যে, তারা চাইলে মানুষের রূপ ধারণ করতে পারে। সুতরাং মহান আল্লাহর অনুমতিতে তাদের জন্য এটা সহজ হয়ে যায়।

জিবরীল আলাইহিস সালাম দিহইয়া কালবীর আকৃতিতে আসতেন :

মানুষের আকৃতিতে আসার ক্ষেত্রে জিবরীল আলাইহিস সালাম অধিকাংশ সময় দিহইয়াতাল কালবী রাযিয়াল্লাহু আনহু নামক ছাহাবীর আকৃতিতে আসতেন।

أَنَّ جِبْرِيلَ ﷺ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ فَجَعَلَ يُحَدِّثُ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأُمِّ سَلَمَةَ مَنْ هَذَا قَالَتْ هَذَا دِحْيَةُ قال فقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ايْمُ اللَّهِ مَا حَسِبْتُهُ إِلَّا إِيَّاهُ حَتَّى سَمِعْتُ خُطْبَةَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ يُخْبِرُ عن جِبْرِيلَ.

উসামা ইবনু যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা জিবরীল আলাইহিস সালাম আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে আসলেন এমতাবস্থায় তার নিকটে উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন। জিবরীল আলাইহিস সালাম আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কথা শেষ করে চলে গেলেন। তখন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জানো, সে কে? উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, সে দিহইয়াতুল কালবী। উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা (পরবর্তীতে) বলেন, আমি তাকে দিহইয়াতুল কালবীই মনে করেছিলাম, যতক্ষণ না আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খুৎবা শুনলাম এবং তিনি জানালেন যে, তার নিকট জিবরীল আলাইহিস সালাম এসেছিলেন।[৩]

অন্যত্র স্বয়ং রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا دَحْيَةُ 'আমি জিবরীল আলাইহিস সালাম-কে দেখেছি; তিনি দেখতে দিহইয়ার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ'।[৪]

তবে সবসময় যে দিহইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর আকৃতিতে আসতেন তা নয়; বরং কখনো কখনো অন্য আকৃতিতেও আসতেন। যেমন বিখ্যাত হাদীছে জিবরীলে এসেছে, بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ 'একদিন আমরা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলাম; হঠাৎ

---

* এম. এ (অধ্যয়নরত), উলূমুল হাদীছ বিভাগ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

১. ফাতহুল বারী, ১/২৬।

২. প্রাগুক্ত।

৩. ছহীহ বুখারী, হা/৩৬৩৪; ছহীহ মুসলিম, হা/২৪৫১।

৪. ছহীহ মুসলিম, হা/২৭১।

আমাদের সামনে ধবধবে সাদা পোশাকে ও কালো চুলবিশিষ্ট একজন লোক আসলেন। যার চেহারায় সফরের কোনো আলামত ছিল না; তাকে আমাদের মধ্যে কেউ চিনত না’।[৫] এই হাদীছে উল্লেখিত আগন্তুক জিবরীল আলাইহিস সালাম ছিলেন। এ হাদীছ প্রমাণ করে যে, যদি তিনি দেখতে দিহইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মতো হতেন, তাহলে অবশ্যই কেউ না কেউ তাকে চিনত। যেহেতু তাকে কেউ চিনতে পারেনি, সেহেতু অবশ্যই সেদিন জিবরীল আলাইহিস সালাম দিহইয়া ব্যতীত আলাদা ব্যক্তির বেশ ধারণ করে এসেছিলেন।

অহির সাথে কেন ঘণ্টাধ্বনির মতো অপছন্দনীয় জিনিসের সাদৃশ্য দেওয়া হলো?

অনেকেই অভিযোগ উত্থাপন করেছেন যে, অহির মতো মর্যাদাপূর্ণ শব্দকে কেন ঘণ্টাধ্বনির মতো অপছন্দনীয় বিষয়ের শব্দের সাথে তুলনা দেওয়া হলো? এই প্রশ্নের উত্তর মুহাদ্দিছগণ বিভিন্নভাবে দিয়েছেন।

প্রথমত, ইসলামের দৃষ্টিতে ঘণ্টাধ্বনিকে যখন সুললিত করে সুমধুরভাবে কানের জন্য মধুময় করে নির্দিষ্ট তালে বাজানো হয়, তখন সেটা অপছন্দনীয় হয়। কিন্তু স্বাভাবিক ঘণ্টাধ্বনি অপছন্দনীয় নয়। আর এই হাদীছে স্বাভাবিক ঘণ্টাধ্বনির সাথে তুলনা দেওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট তালের কোনো বাজনার সাথে নয়।

দ্বিতীয়ত, উক্ত হাদীছে ঘণ্টাধ্বনির গুরুত্ব বা মানুষের অন্তরে তার জন্য আগ্রহ সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য নয়; বরং ঘণ্টাধ্বনির পরস্পর আওয়াজ উদ্দেশ্য। যাতে মানুষের সামনে অহির আওয়াজের ধরনটা স্পষ্ট হয়। যেমন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘ইসলাম মদীনায় ফিরে আসবে, যেভাবে সাপ তার গর্তে ফিরে আসে’।[৬]

উক্ত হাদীছে ইসলামের মতো মহান বিষয়ের তুলনা দেওয়া হয়েছে সাপের সাথে, যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে কটু মনে হলেও বাস্তব উদ্দেশ্য চিন্তা করলে যৌক্তিক মনে হবে। এখানে সাপের গুরুত্ব বুঝানো উদ্দেশ্য নয়; বরং সাপ যেমন গর্ত থেকে বের হয়ে ইচ্ছামতো ঘুরাফেরা করে দিন শেষে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে নিজের গর্তে ফিরে যায়, ঠিক তেমনি ইসলাম মদীনা থেকে বের হয়ে পুরো দুনিয়া বিজয় করে একটা সময় পুরো দুনিয়া থেকে ইসলামের আসল রূপ হারিয়ে পুনরায় মদীনায় ফিরে যাবে।

এই ধরনের উদাহরণ আরো বিভিন্ন হাদীছে পাওয়া যাবে। যেমন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবি হিসেবে বিখ্যাত ছাহাবী হাসসান রাযিয়াল্লাহু আনহু মুশরিকদের কটূক্তির জবাবে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে লক্ষ্য করে বলেন, لَأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعَرَةُ مِنَ الْعَجِيْنِ ‘(হে আল্লাহর রাসূল!) আমি আপনাকে মুশরিকদের কাব্য আক্রমণ থেকে এমনভাবে বের করে নিয়ে আসব, ঠিক যেভাবে আটা থেকে চুলকে বের করা হয়’।[৭]

উক্ত হাদীছে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে চুলের তুলনা করা হয়েছে। এটা বাহ্যিক দৃষ্টিতে কটু মনে হলেও বাস্তবে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, আটার খামির থেকে চুল বের করে আনলে যেমন তার গায়ে কোনো কিছু লেগে থাকে না, ঠিক তেমনি তিনি কাব্য আক্রমণ থেকে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নিষ্কলুষভাবে বের করে আনবেন।

সুতরাং এই ধরনের সাদৃশ্যতে শারঈ দৃষ্টিতে কোনো সমস্যা নেই। ওয়াল্লাহু আ‘লাম বিছ ছওয়াব।

অহির শব্দের ধরন নিয়ে পরস্পরবিরোধী হাদীছ ও সামঞ্জস্য :

আমাদের আলোচ্য হাদীছে অহির শব্দকে ঘণ্টাধ্বনির সাথে তুলনা করা হয়েছে। অন্যদিকে অন্য কিছু হাদীছে ভিন্ন রকম তথ্য পাওয়া যায়। যথা—

উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ يُسمع عِنْدَ وَجْهِهِ كَدَوِيِّ النَّحْلِ ‘রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর যখন অহি অবতীর্ণ হতো, তখন তার মুখের নিকট থেকে মৌমাছির ভনভনানির মতো আওয়াজ শুনা যেত। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِذَا قَضَى اللهُ أَمْرًا فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتْ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتَهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ ‘যখন মহান আল্লাহ আসমানে কোনো নির্দেশ জারি করেন,

৫. ছহীহ মুসলিম, হা/১; তিরমিযী, হা/২৬১০।

৬. ছহীহ বুখারী, হা/১৮৭৬; ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৬।

৭. ছহীহ বুখারী, হা/৪১৪৫; ছহীহ মুসলিম, হা/২৪৯০।

তখন ফেরেশতামণ্ডলী তাদের পাখা আসমানে মারতে থাকে। তাদের এই পাখার আঘাতে পাথরের উপরে জিঞ্জিরের পরস্পর আঘাতের ন্যায় শব্দ তৈরি হয়।

উপরিউক্ত দুটি হাদীছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো অহির শব্দের দুই ধরনের আওয়াজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই পরস্পরবিরোধী হাদীছের সমাধানে মুহাদ্দিছগণ যা বলেছেন, তার সারমর্ম হচ্ছে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে মতবিরোধ মনে হলেও প্রকৃত অর্থে কোনো পারস্পরিক বিরোধ নেই। বরং এই বাহ্যিক বিরোধের সমাধান হচ্ছে, অহির শব্দ যখন ফেরেশতাগণ শোনেন, তখন পাথরের উপর জিঞ্জিরের শব্দের ন্যায় শুনতে পান। অহিকে যখন মুহাম্মাদ ﷺ শোনেন, তখন ঘণ্টাধ্বনির মতো শব্দ শুনতে পান। অহিকে যখন ছাহাবায়ে কেরাম শোনেন, তখন মৌমাছির ভনভনানির মতো শুনতে পান। অর্থাৎ শ্রোতার পার্থক্য ভেদে আওয়াজের পার্থক্য হয়। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

অধ্যায়ের নামের সাথে হাদীছের সম্পর্ক :

আমাদের আলোচ্য অধ্যায়ের নাম 'অহির শুরু' কিন্তু এই হাদীছে অহির শুরু নিয়ে কোনো আলোচনা করা হয়নি। এই অভিযোগের উত্তরে মুহাদ্দিছগণ, যা বলেছেন তার সারমর্ম নিম্নরূপ :

প্রথমত, এই হাদীছে অহির যে ধরনগুলো বলা হয়েছে, সেগুলোর কোনো একটা মাধ্যম দিয়েই হয়তো অহির যাত্রা শুরু হয়েছে। সুতরাং অধ্যায় ও হাদীছের মধ্যে কোনো সমস্যা নেই।

দ্বিতীয়ত, এই অধ্যায়ে শুধু অহি শুরুর ইতিহাস বলা উদ্দেশ্য নয়; বরং অহি সংশ্লিষ্ট সবকিছুর বর্ণনা দেওয়া উদ্দেশ্য। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, অহি অবতীর্ণ হওয়ার পদ্ধতিসমূহের আলোচনা, যা এই হাদীছে আলোচিত হয়েছে। সুতরাং অধ্যায় ও হাদীছের মধ্যে সামঞ্জস্য তথা সম্পর্ক স্পষ্ট।

শিক্ষণীয় বিষয় :

১. ইলমী বিষয়ে জিজ্ঞেস করা জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম।

২. ফেরেশতা মানুষের রূপ ধারণ করতে পারে।

৩. অহি অনেক ভারী বিষয়, যা বহন করা বা গ্রহণ করা অনেক কষ্টের।

৪. মানুষের সাথে মহান আল্লাহর যোগাযোগের বা অহি আসার কয়েকটি মাধ্যম হতে পারে, যেমনটি হাদীছে ফুটে উঠেছে।

৫. রাসূল ﷺ মাটির তৈরি, যার ফলে অহি গ্রহণ করতে তার এত কষ্ট হয়েছে।

(চলবে)

بسم الله الرحمن الرحيم

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত
প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বর সমূহ

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ, জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য :
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ জেনারেল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৭০১
বিকাশ নং- ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ (পারসোনাল)

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রমের জন্য :
বায়তুল হামদ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৩১৬
বিকাশ নং- ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ (মার্চেন্ট)

মানবসেবামূলক কার্যক্রমের জন্য :
নিবরাস ত্রাণ তহবিল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৯০৩
বিকাশ নং- ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮ (পারসোনাল)

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রমের জন্য
নিবরাস ইয়াতিম কল্যাণ ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৬০০
নগদ নং- ০১৪০৭-০২১৮০০ (পারসোনাল)
রকেট নং- ০১৭৮৪-২১৩১৭৮-৫ (পারসোনাল)

পত্রিকা ও বই ফ্রি বিতরণ এবং দাঈ নিয়োগসহ বিভিন্ন দাওয়াহ কার্যক্রমের জন্য :
আল-ইতিছাম দাওয়াহ ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৮০২
বিকাশ নং- ০১৭৯৩-৬৩৮১৮০ (এজেন্ট)

যাকাতের জন্য :
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ যাকাত ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৪১৭
বিকাশ নং- ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫ (পারসোনাল)

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বীরহাটাব-হাটাব, বীরাব, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
নারায়ণগঞ্জ শাখা : বীরহাটাব-হাটাব, বীরাব, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮, ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯
রাজশাহী শাখা : ডাঙ্গীপাড়া, পবা, শাহমুখদুম, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৮৭-০২৫০৬০, ০১৭২৪-৩৮৪৮৫৫

হক্বের মানদণ্ড

মূল (উর্দূ) : সাইয়্যেদ মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী রহিমাহুল্লাহ
*অনুবাদ : আখতারুজ্জামান বিন মতিউর রহমান**

(পর্ব-৩)

সনদের গুরুত্ব : ইবনুল মুবারাক রহিমাহুল্লাহ বলেন, الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء অর্থাৎ সনদ হচ্ছে দ্বীনের অংশ। কেননা দ্বীনের ক্ষেত্রে যদি সনদের গ্রহণযোগ্যতা না থাকত তাহলে সত্য-মিথ্যার বাছবিচার না করে যার যা ইচ্ছা তাই বলত। এ জন্যই অধিকাংশ আলেমদের নিকট মুআল্লাক্ব বর্ণনা (বিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণিত হাদীছ) শরীআতের দলীল হতে পারে না।[১]

আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, ইমাম ত্বহত্বী রহিমাহুল্লাহ-এর তিনটি হাদীছ ব্যতীত অন্য কোনো বর্ণনা দ্বারা ইমাম মুসলিমের মূলনীতি অনুযায়ীও ছাহাবীর সাথে ইমাম আবূ হানীফার সাক্ষাৎ সাব্যস্ত নয়। আশ্চর্যের বিষয় হলো ইমাম আবূ হানীফার সূত্রে ইমাম ত্বহত্বীর বর্ণিত তিনটি হাদীছ অধিকাংশের নিকট মাওযূ তথা জাল। বিশেষ করে প্রথম হাদীছটিকে অধিকাংশ বিশ্লেষক মুহাদ্দীছগণ জাল বলেছেন। সুতরাং ইমাম মুসলিমের মূলনীতির উপর নির্ভর করে কীভাবে একই যুগের হওয়ার ভিত্তিতে আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর সাথে ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ-এর সাক্ষাৎ প্রমাণ করবেন?! এই হাদীছগুলো যে জাল তার প্রমাণ দেখুন।

'মাজমাউল বিহার' গ্রন্থের লেখক শায়খ ইবনু তাহের হানাফী রহিমাহুল্লাহ বলেন, طلب العلم فريضة على كل مسلم روي عن أنس بطرق كلها معلومة واهية وقال أحمد: لا يثبت في هذا الباب شئ وكذا قال ابن راهويه وابو علي النيسابوري والحاكم انتهى مختصرا 'এই হাদীছটি আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যার সবগুলো সূত্রই দুর্বল। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, এই বিষয়ে কোনো হাদীছ প্রমাণিত হয়নি। ইবনু রাহওয়াই, আবূ আলী নিসাপূরী এবং ইমাম হাকেম অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। নূরুদ্দীন আলীও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন'।[২] ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এই হাদীছটি বাতিল। এর কোনো ভিত্তি নেই'।[৩] ইবনুল জাওযী উক্ত হাদীছটিকে তার 'মাওযূআত' (জাল হাদীছ সংকলন) নামক গ্রন্থে উল্লেখ্য করেছেন।[৪]

সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আমীন (ইবনুল আবেদীন) বলেন, وجاء من طرق أنه روي عنه أحاديث ثلاثة لكن قال أئمة المحدثين مدارها على من اتهمته الأئمة بوضع الأحاديث 'ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ হতে উক্ত তিনটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু যে বর্ণনাকারীদের উপর হাদীছ তিনটি নির্ভর করে, তাদের প্রত্যেককে মুহাদ্দীছ ইমামগণ হাদীছ জালকারী দোষে অভিযুক্ত করেছেন'।[৫] তিনি আরও বলেন, 'তাহযীবুল আসমা' নামক গ্রন্থে ইমাম নববী শাফেঈ এবং ইয়াফী শাফেঈ রহিমাহুমাল্লাহ তার লিখিত ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন যে, জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ ইবনু উনাইস, আয়েশা বিনতু আজরাদ, ওয়াছেলা ইবনুল আসক্বা এবং আব্দুল্লাহ ইবনু জায' আয-যুবাইদী রহিমাহুমুল্লাহ ও ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ-এর যুগে জীবিত ছিলেন এবং তাদের থেকে বর্ণনাও করেছেন। ত্বহত্বী গ্রন্থের মধ্যে তা বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ ৯৪ হিজরীতে ১৪ বছর বয়সে কূফা নগরীতে আব্দুল্লাহ ইবনু উনাইস রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে নিম্নের এই হাদীছ শুনেছেন, حبك الشئ يعمي ويصم 'কোনো কিছুর অতিমাত্রার ভালোবাসা মানুষকে অন্ধভক্ত ও বধির বানিয়ে দেয়'।[৬] তিনি আরও বলেন, ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ আয়েশা বিনতু আজরাদ রহিমাহুল্লাহ থেকে নিম্নোক্ত হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

---

* শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১. শারহু নুখবাতুল ফিকার, 'মুআল্লাক্ব হাদীছের বর্ণনা', পৃ. ৬২।

২. তানযীহুশ শরীআহ, 'ইলম' অধ্যায়, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, ১/২৫৮।

৩. কিতাবুল মাজরূহীন, 'তারজুমাতু তা'রেফু ইবনু সালমান', ১/৩৮২।

৪. কিতাবুল মাওযূআত, 'ইলম' অধ্যায়, ১/১৫৪; আল-ফাওয়ায়েদুল মাজমূআহ, 'কিতাবুল ফাযায়েল', 'ইলমের ফযীলত' অধ্যায়, পৃ. ২৭২।

৫. রাদ্দুল মুহতার, 'ভূমিকা', ১/৪৪।

৬. ত্বহত্বী, 'ভূমিকা', ১/৪৭।

أكثر جند الله في الأرض الجراد لا آكله ولا احرمه

‘যমীনে আল্লাহর সবচেয়ে বড় সৈন্যদল হলো পঙ্গপাল, আমি তা খাই না এবং হারাম হিসাবে সাব্যস্ত করি না’।[৭] তিনি আরও বলেন, ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ ওয়াছেলা ইবনুল আসক্বা থেকে দুইটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

এক. دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ ‘যে বিষয়ে তোমার সন্দেহ হয় তা ছেড়ে দিয়ে যাতে সন্দেহের সম্ভবনা নেই তা গ্রহণ করো’।[৮]

দুই. لا تظهر شماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك ‘তোমার ভাইয়ের কষ্টে আনন্দ প্রকাশ করো না। করলে আল্লাহ তাকে কষ্ট হতে মুক্তি দিবেন এবং তোমাকে পরীক্ষার সম্মুখীন করে দিবেন’।[৯] তিনি আরও বলেছেন, ৯৬ হিজরীতে ইমাম আবূ হানীফা তার পিতার সাথে হজ্জে গিয়ে আব্দুল্লাহ ইবনু হারেছ ইবনু জায‘ থেকে কা‘বার নিকটে এই নিম্নের হাদীছ শুনেছেন।

এক. إعانة المسلم فريضة على كل مسلم ‘অপর মুসলিমের সাহায্য করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয’।[১০]

দুই. من نفقه في الدين كفاه الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب ‘যে ব্যক্তি দ্বীনের জন্য সম্পদ ব্যয় করবে আল্লাহ তার পেরেশানী দূর করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট হয়ে যাবেন এবং তাকে এমন স্থান থেকে রিযিক্ব দিবেন যার কল্পনা সে করেনি’।[১১]

আর জাবের রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, একজন আনছারী ব্যক্তি নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন, আমার কোনো ছেলে সন্তান হয় না। তখন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, فأين كنت من كثرة الاستغفار وكثرة الصدقة يرزق بها الولد ‘তুমি বেশি বেশি ক্ষমা চাও এবং বেশি বেশি দান করো তাহলে এর বিনিময়ে আল্লাহ তোমাকে ছেলে সন্তান দান করবেন। অতঃপর ঐ ব্যক্তি বেশি বেশি দান ও ইস্তেগফার করা আরম্ভ করলে তার নয়টি ছেলে সন্তান হয়।

জবাব : আল্লাহর নিকট মিথ্যুকদের থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি! এই চার জন ছাহাবীর সাথে ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ-এর সাক্ষাৎ এবং তাদের থেকে হাদীছ বর্ণনা মর্মে মিথ্যা দাবির খণ্ডন করার পর এবং এই দাবির খণ্ডনে ইবনু তাহের, ইবনু খাল্লিক্বান, ইমাম নববী এবং ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী রহিমাহুল্লাহ-এর সুস্পষ্ট বক্তব্য পেশ করার পর তাদের এই দাবির আর খণ্ডন করার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু লেখক যেহেতু ছহীহ ও ভুল বর্ণনার পার্থক্য না করে শায়খ মুহাম্মাদ শাহ নাওয়ামুয-এর অন্ধ অনুসরণ করতে গিয়ে এই ব্যাপারে মারাত্তক ভুল করেছে, তাই এরও একটি তাহক্বীক্ব হওয়া জরুরী।

তাহক্বীক্ব : তাদের দাবি অনুসারে জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ ইবনু উনাইস এবং অন্যান্যরা ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ-এর যুগে জীবিত ছিলেন এবং তাদের থেকে ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

এই কথাকে ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ-এর দিকে ধাবিত করা (যেমনটি ‘তানভীরুল হক্ব’-এর লেখক করেছেন) মিথ্যা এবং (নাঊযুবিল্লাহ) এই মিথ্যুক থেকে আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। কেননা ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ ‘তাহযীবুল আসমা’ গ্রন্থের কোথাও এ কথা বলেননি যে, ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ-এর যুগে তারা জীবিত ছিলেন। কারো সন্দেহ হলে ‘তাহযীবুল আসমা’ খুলে দেখতে পারেন; বরং ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ-এর কথা দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ এবং আব্দুল্লাহ ইবনু উনাইস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ-এর জন্মের কয়েক বছর আগে মৃত্যুবরণ করেছেন। সামনে এই বিষয়ে আলোকপাত করা হবে। লেখক যখন ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ-এর বক্তব্যের উদ্ধৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে ভুল তথ্য দিয়েছেন। তখন বোঝাই যাচ্ছে ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ-এর বক্তব্য উপস্থাপনেও তিনি একই ভুল করেছেন। তবে ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ-এর কথা যে, ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ-এর যুগে এই সকল ছাহাবী জীবিত ছিলেন এবং তাদের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়েছে এবং তাদের থেকে তিনি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আসুন! দেখা যাক, এর আসল রহস্য। ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ-এর জীবনীসম্বলিত কিতাব ‘মিরআতুল জিনান’ গ্রন্থের মূল বক্তব্য উপস্থাপন করার মাধ্যমে কোনটি সত্য আর কোনটি মিথ্যা তা জানার চেষ্টা করি।

قال العيافي في تاريخ مراءة الجنان في حوادث سنة خمسين ومائة فيها توفي فقيه العراق الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي مولى بني تيم الله بن ثعلبة ومولده سنة ثمانين رأى أنسا وروى عن عطاء بن أبي رباح وطبقته. فكان قد أدرك أربعة من الصحابة هم أنس بن مالك بالبصرة وعبد الله بن أبي أوفى بالكوفة وسهل بن سعد الساعدي بالمدينة وأبو طفيل عامر بن واثلة بمكة. قال بعض أصحاب التاريخ ولم ير أحدا منهم ولا أخذ عنه وأصحابه يقولون لقي جماعة من الصحابة وروي عنهم ولم يثبت ذالك عند أهل النقل.

৭. প্রাগুক্ত।
৮. প্রাগুক্ত
৯. প্রাগুক্ত।
১০. প্রাগুক্ত।
১১. মুসনাদে খাওয়ারেযমী, ১/২৪।

‘ইয়াফী রহিমাহুল্লাহ “রআতুল জিনান” নামক গ্রন্থে বলেন, বনি তায়মুল্লাহর দাস ইরাকের বিদ্বান ইমাম আবূ হানীফা নূ‘মান ইবনু ছাবেত আল-কূফী রহিমাহুল্লাহ, ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর সাক্ষাৎ পান। আতা ইবনু আবি রিবাহ এবং তার সমকালীনদের থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি চার জন ছাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেন; বাছরা নগরীতে আনাস ইবনু মালেক, কূফা নগরীতে আব্দুল্লাহ ইবনু আবি আওফা, মদীনা নগরীতে সাহল ইবনু সা‘দ এবং মক্কা নগরীতে আবূ তুফাঈল আমের ইবনু ওয়াছেলা রাযিয়াল্লা-হু আনহুম। কিন্তু অনেক ইতিহাসবেত্তা বলেছেন, ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ তাদের কারো সাথে সাক্ষাৎ লাভ করতে পারেননি এবং তাদের থেকে কোনো হাদীছও বর্ণনা করেননি। তবে তার কিছু সাথিরা বলে থাকেন যে, তিনি একদল ছাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন এবং তাদের থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাদের এই বক্তব্য কোনো দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়।[১২]

উক্ত আলোচনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, ইতিহাস প্রমাণ করে জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ এবং আব্দুল্লাহ ইবনু উনাইস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা-এর সাথে ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ-এর সাক্ষাৎ লাভের কথা উল্লেখ নেই। সুতরাং এটা শুধু ধোঁকাবাজি বৈ কিছুই নয়। আর কুরত্বাসীর বর্ণনার উপর নির্ভর করা লজ্জাকর বিষয়। যদিও যুক্তির দাবিতে মেনেও নেওয়া হয় যে, ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ ছাহাবীদের সাথে সাক্ষাতের কথা বলেছেন, তবুও ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ-এর এই কথা অগ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে এবং বিবেক এবং বর্ণনার বিরোধী হবে। কেননা এই পাঁচ জন ছাহাবীর মধ্য হতে কোনো ছাহাবীর সাথে তার সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব বিষয়। কথার কথা ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ যদি বলেন, ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ আদম আলাইহিস সালাম-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন, তাহলে কি তার এই কথা গ্রহণযোগ্য হয়ে যাবে?! জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর সাথে ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ-এর সাক্ষাৎ হয়নি তার প্রমাণ হলো, ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ-এর জন্মের এক বছর পূর্বে জাবের রাযিয়াল্লা-হু আনহু ইন্তেকাল করেন। অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন আর জাবের রাযিয়াল্লা-হু আনহু ৭৯ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। ইবনুল আবেদীন আশ-শামী রহিমাহুল্লাহ ‘রাদ্দুল মুখতার’ গ্রন্থে বলেছেন, بأنه مات قبل ولادة الإمام بسنة ‘ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ-এর জন্মের এক বছর পূর্বে জাবের রাযিয়াল্লা-হু আনহু মৃত্যুবরণ করেছেন’।[১৩] ইবনু শাহীন রহিমাহুল্লাহ বলেন, هذا وهم صريح فإن جابر بن عبد الله باتفاق الروايات مات في بضع وسبعين ثمانين وهي التي ولد فيها الإمام أبو حنيفة. فكيف ولم يعش إلى يتصور رواية عنه ‘সকল বর্ণনার ঐকমত্যে একথা সুস্পষ্ট যে, জাবের রাযিয়াল্লা-হু আনহু ৮০ হিজরী পর্যন্ত জীবিত ছিলেন না, যে হিজরীতে ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ-এর জন্মগ্রহণ করেছিলেন; বরং তার জন্মের কয়েক বছর পূর্বে জাবের রাযিয়াল্লা-হু আনহু মৃত্যুবরণ করেন। সুতরাং ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করার কথা কীভাবে চিন্তা করা যায়’।[১৪] ‘তাহযীবুল আসমা’ নামক গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। জাবের রাযিয়াল্লা-হু আনহু ৭৩ হিজরীতে মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন। আবার অনেকে বলেছেন, ৭৮ বা ৬৮ হিজরীতে। মৃত্যুর সময়ে তার বয়স ছিল ৯৪ বছর। আর শেষ বয়সে তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছিলেন।[১৫]

‘তানভীরুল হক্ব’-এর লেখক জাবের রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে যে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন এবং দাবি করেছেন, হাদীছটি ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ জাবের রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, সে হাদীছটি মূলত মাওযূ বা জাল। হানাফী বিদ্বান আল্লামা শামী রাদ্দুল মুখতারে বলেছেন হাদীছটি মাওযূ বা জাল।[১৬]

⇒ যদি কেউ আপত্তি তোলে যে, এক বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ ৭০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাহলে তো ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ-এর সাথে জাবের রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে?

জবাব : তোমরা সঠিক ও গ্রহণযোগ্য মত গ্রহণকারী যদি হয়ে থাক তাহলে ৭০ হিজরীতে জন্মগ্রহণের বর্ণনাকে প্রত্যাখ্যাত বলে মেনে নাও। কেননা জমহূর বিদ্বানদের মতে ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। লেখক মহাশয়ও বলেছেন, ইমাম আবূ ইউসুফ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। সুতরাং ৮০ হিজরীতে জন্ম একথাই সত্য ৭০ হিজরীতে জন্ম একথা নিছক মিথ্যা। এই তাহক্বীক্ব যদি তোমাদের নিকট গ্রহণীয় না হয় তাহলে ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ-এর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, জাবের রাযিয়াল্লা-হু আনহু আট হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন সেটাকে মেনে নাও। (যে দিকে যায় সে দিকের দরজা বন্ধ - অনুবাদক)।

⇒ যদি কেউ আপত্তি তোলে যে, উক্ত হাদীছটি তো ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ-এর মুসনাদে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাহলে কীভাবে বলা যায় যে, হাদীছটি মাওযূ বা জাল?!

জবাব : উক্ত হাদীছটিকে ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ নিজে লিপিবদ্ধ করেননি। কেননা তার নামে ‘মুসনাদে আবি হানীফা’-এর হাদীছসমূহ তার নিজ হাতে একত্রিত করা হাদীছ নয়; বরং ৬৭৪ হিজরী পর্যন্ত ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ-এর মুসনাদগুলোকে অনেক মানুষ পৃথক পৃথকভাবে সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন। পরবর্তীতে ৬৭৪ হিজরীতে খাওয়ারেযমী সবগুলোকে একত্রিত করেন।[১৭]

(চলবে)

---

১২. মিরআতুল জিনান, ১/১৫০।

১৩. রাদ্দুল মুখতার, ‘ভূমিকা’, ১/৪৪।

১৪. ত্বহত্বাবী ‘ভূমিকা’, ১/৪৭।

১৫. তাহযীবুল আসমা ফী তরজুমাতু জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ।

১৬. রাদ্দুল মুহতার, ‘ভূমিকা’, ১/৪৪।

১৭. বুসতানুল মুহাদ্দীছিন, তাযকিরাতু মুওয়াত্ত্বা ইমাম আযম, পৃ. ৫০।

মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার ১০টি উপায়!

-আতাউর রহমান*

(শেষ পর্ব)

(৯) বেশি বেশি দু'আ করা : মানসিক চাপ দূর করতে বেশি বেশি দু'আ করাও অন্যতম মাধ্যম। দু'আ সম্পর্কে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, নু'মান ইবনু বাশীর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِى أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ 'দু'আই হলো ইবাদত। তারপর তিনি পাঠ করেন, (অনুবাদ) 'তোমাদের রব বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। যারা অহংকারবশত আমার ইবাদত থেকে বিমুখ হয়, নিশ্চিত তারা অচিরেই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে'।[১] অন্য আরেকটি হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ 'যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে দু'আ করে না, আল্লাহ তার উপর রাগান্বিত হন'।[২]

আসুন, আমরা এখন যেনে নিই কীভাবে এবং কোন সময়ে দু'আ করলে দু'আ কবুল হয় বলে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘোষণা করেছেন।

দু'আ ইউনুস পাঠ করে দু'আ করলে দু'আ কবুল হয়। এ সম্পর্কে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ سَعْدٍ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا رَبَّهُ وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ {لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ} لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ.

সা'দ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যুননুন (মাছওয়ালা) ইউনুস (আলাইহিস সালাম) যখন মাছের পেটে ছিলেন, তখন তিনি তাঁর রবের নিকট দু'আ করেছিলেন। তা হলো *"লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনায যালিমিন"*। তারপর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'যদি কোনো মুসলিম ব্যক্তি যে কোনো বিষয়ে উক্ত দু'আর মাধ্যমে দু'আ করে, আল্লাহ অবশ্যই তার দু'আ কবুল করেন'।[৩] অন্য আরেকটি হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, যে কোনো ধরনের বিপদাপদে ও দুশ্চিন্তায় দু'আ ইউনুস পাঠ করলে বিপদাপদ ও দুশ্চিন্তা দূর করে দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَيْءٍ إِذَا نَزَلَ بِرَجُلٍ مِنْكُمْ كُرَبٌ أَوْ بَلَاءٌ مِنْ بَلَايَا الدُّنْيَا دَعَا بِهِ يُفْرَجُ عَنْهُ ؟ فَقِيْلَ لَهُ : بَلَى فَقَالَ : دُعَاءُ ذِي النُّوْنِ : لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ 'আমি কি তোমাদের এমন একটি বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দিব না? তোমাদের কারো উপর যখন কোনো দুঃখ-কষ্ট অথবা দুনিয়ার কোনো বিপদ আসবে, তখন সে যদি সেই বিষয়ের মাধ্যমে দু'আ করে, তাহলে তার থেকে বিপদ দূর করে দেওয়া হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলা হলো, হ্যাঁ বলুন। তখন তিনি বললেন, তা হলো যুননূন (মাছওয়ালা) ইউনুস (আলাইহিস সালাম)-এর দু'আ। তা হলো 'লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনায যালিমীন'।[৪]

নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিপদের সম্মুখীন হলে যে দু'আটি পাঠ করতেন,

عَن ابْن عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ، وَرَبُّ الأَرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ».

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিপদের সময় বলতেন, *'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল আযীমুল হালীম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রব্বুল আরশিল আযীম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রব্বুস সামাওয়াতি ওয়া রব্বুল আরযি ওয়া রব্বুল আরশিল কারীম'*।[৫] অন্য আরেকটি হাদীছে এসেছে, আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বেশি বেশি এই দু'আ পাঠ করতেন, اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ উচ্চারণ : *আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হাযানি ওয়াল আজযী ওয়াল কাছালি ওয়াল বুখলি ওয়াল জুবনি ওয়া যলাইদ দায়নি ওয়া গালাবাতির রিজাল*। অর্থ : হে আল্লাহ! আমি দুশ্চিন্তা ও পেরশানী থেকে, অক্ষমতা ও অলসতা থেকে, কৃপণতা ও ভীরুতা থেকে, ঋণভার ও লোকজনের প্রাধান্য থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি'।[৬]

সুতরাং যেকোনো বিপদাপদে, মানসিক চাপের সময় দু'আ ইউনুসসহ নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে দু'আগুলো পড়তেন, তা আমাদের পড়া উচিত। একটি হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)

* শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বীরহাটাব-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. আবূ দাঊদ, হা/১৪৭৯; সূরা আল-মুমিন, ৪০/৬০।
২. তিরমিযী, হা/৩৩৭৩, হাদীছ ছহীহ; মিশকাত, হা/২২৩৮।
৩. তিরমিযী, হা/৩৫০৫; আহমাদ, হা/১৪৬২, হাদীছ ছহীহ।
৪. সিলসিলা ছহীহা, হা/১৭৪৪।
৫. ছহীহ বুখারী, হা/৬৩৪৬; ছহীহ মুসলিম, হা/২৭৩০।
৬. ছহীহ বুখারী, হা/২৮৯৩।

থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো বিষয়ে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লে বলতেন, يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ উচ্চারণ : *ইয়া হাইয়্যু, ইয়া ক্বইয়্যূমু বিরহমাতিকা আসতাগীছ*। অর্থ : হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী! আমি তোমার রহমতের অসীলায় সাহায্য প্রার্থনা করছি'।[৭] আর কিছু সময় রয়েছে, যে সময় দু'আ কবুল হয়। যেমন- রাতের শেষ ভাগের দু'আ। কারণ এসময় মহান আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন, مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ 'কে আছে এমন, যে আমাকে ডাকবে? তাহলে আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আছে এমন, যে আমার নিকট চাইবে? আমি তাকে তা দান করব। কে আছে এমন, যে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে? আমি তাকে ক্ষমা করে দিব'।[৮]

শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, যদি কোনো বান্দা শেষ রাতে সাহরীর সময় তার রবের কাছে মুনাজাত করে এবং তাঁর কাছে সাহায্য চায় এ বলে, يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে এমন শক্তি দান করবেন, যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না'।[৯]

(১০) অল্পে তুষ্ট থাকা : অল্পে তুষ্টি মুমিন চরিত্রের ভূষণ, সুখী জীবন লাভের অন্যতম হাতিয়ার। অল্পে তুষ্টির এই অনন্য গুণটি যে অর্জন করতে পারে, জীবনের শত দুঃখ-কষ্ট ও অপূর্ণতায় তার কোনো আক্ষেপ থাকে না। আল্লাহ প্রদত্ত নির্ধারিত জীবন-জীবিকায় তিনি পরিতৃপ্ত থাকেন। অল্পে তুষ্ট থাকার মধ্যেই কল্যাণ ও সফলতার ভিত্তি প্রোথিত থাকে। কারণ অতিভোগী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও মাত্রাতিরিক্ত বিলাসী জীবন মুমিনের অন্তর থেকে আল্লাহভীতি দূর করে দেয়, ইবাদতের আগ্রহ নষ্ট করে ফেলে। মানুষকে চরম হতাশাগ্রস্ত ও অস্থির করে তোলে। তাই সুখী ও প্রশান্ত জীবন লাভের জন্য অল্পে তুষ্টির গুণ অর্জন করা অপরিহার্য। অল্পে তুষ্টির আলোচনা করা অনেকটা সহজ হলেও এই মহান গুণ অর্জন করা ততটা সহজ নয়। তবে প্রকৃত ঈমানদার ও পরহেযগার বান্দাদের জন্য এই গুণ অর্জন করা কঠিন নয়। আর অল্পতেই পরিতৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হওয়া এ মহৎ গুণটি যার অর্জিত হবে, জীবনে শত দুঃখ-কষ্ট, হতাশা ও অপূর্ণতায় তার কোনো আক্ষেপ থাকবে না। আল্লাহ প্রদত্ত নির্ধারিত জীবন-জীবিকায় তিনি তুষ্ট থাকবেন।

অল্পে তুষ্টি অর্জনের অনেক পন্থা রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম একটি পন্থা হলো, সবসময় নিজের চেয়ে নিম্নমানের লোকের দিকে লক্ষ করা। আর এ নিম্নমান কয়েক দিক থেকে হতে পারে। যেমন- অর্থসম্পদে, সুস্থতায়, শারীরিক গঠনে, সুখ-শান্তিতে ইত্যাদি। এতে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ জাগ্রত হবে। লোভ-লালসা ও হতাশা দূর হয়ে যাবে। এজন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ 'তোমাদের কারো নযর যদি এমন লোকের উপর পড়ে, যাকে ধনসম্পদ ও দৈহিক গঠনে অধিক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, তবে সে যেন এমন লোকের দিকে নযর দেয়, যে তার চেয়ে নিম্নস্তরে রয়েছে'।[১০] অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ 'তোমরা নিজেদের অপেক্ষা নিম্ন অবস্থার লোকের প্রতি তাকাও। এমন ব্যক্তির দিকে তাকিয়ো না, যে তোমাদের চাইতে উচ্চ পর্যায়ের। তাহলে এ পন্থা অবলম্বনই হবে আল্লাহর নেয়ামতকে অবজ্ঞা না করার এক উপযোগী মাধ্যম'।[১১]

মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ কে অল্পে তুষ্টির নির্দেশ দিয়ে বলেন, ﴿لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ 'আমি তাদের কিছু শ্রেণিকে যে ভোগ-উপকরণ দিয়েছি, তার প্রতি তুমি দুই চোখ প্রসারিত করো না। আর তাদের জন্য দুঃখিত হয়ো না এবং মুমিনদের জন্য তোমার বাহু অবনত করো' *(আল-হিজর, ১৫/৮৮)*। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, এ আয়াতে মানুষকে অন্যের ধনসম্পদের প্রতি লোভ করতে নিষেধ করা হয়েছে'।[১২]

সুধী পাঠক! পরিশেষে বলতে চাই, আমরা সকলেই কোনো না কোনোভাবে বালা-মুছীবত, দুঃখ-কষ্ট, দুশ্চিন্তা বা পেরেশানীর কারণে মানসিক চাপে আক্রান্ত। আর এই রোগ থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের উপরে উল্লেখিত আমলগুলো করা উচিত। আমাদের উচিত হতাশ না হয়ে ধৈর্যধারণ করে উক্ত আমলগুলো করা। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে সার্বিক জীবনে অল্পে তুষ্ট থাকা এবং উপরিউক্ত আমলগুলো করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

---

৭. তিরমিযী, হা/৩৫২৪, হাদীছ ছহীহ।

৮. ছহীহ বুখারী, হা/৬৩২১; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৫৮।

৯. মাজমূআ ফাতাওয়া, ২৮/২৪২।

১০. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৯০।

১১. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৯০; ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৬৩; মিশকাত, হা/৫২৪২।

১২. তাফসীরে ত্বাবারী, ১৭/১৪১।

শবেবরাত পালন করা বিদআত

-অধ্যাপক ওবায়দুল বারী বিন সিরাজউদ্দীন*

ভূমিকা :

‘শব’ ফারসী শব্দ, এর অর্থ রাত। ‘বারায়াত’-কে যদি আরবী শব্দ ধরা হয়, তাহলে এর অর্থ হচ্ছে সম্পর্কচ্ছেদ, পরোক্ষ অর্থে মুক্তি। যেমন কুরআন মাজীদে সূরা বারায়াত রয়েছে যা সূরা তওবা নামেও পরিচিত। ইরশাদ হয়েছে, ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ ‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা’ *(আত-তওবা, ৯/১)*। ‘বারায়াত’ শব্দটি যদি ফারসী শব্দ ধরা হয়, তাহলে এর অর্থ হবে সৌভাগ্য। অতএব শবেবরাত শব্দটার অর্থ দাঁড়ায় মুক্তির রজনি, সম্পর্ক ছিন্ন করার রজনি অথবা সৌভাগ্যের রাত।

শবেবরাত শব্দটাকে যদি আরবীতে তরজমা করতে চান তাহলে বলতে হবে ‘লায়লাতুল বারায়াত’। এখানে বলে রাখা ভালো যে, এমন অনেক শব্দ আছে যার রূপ বা উচ্চারণ আরবী ও ফারসী ভাষায় একই রকম, কিন্তু অর্থ ভিন্ন। যেমন ‘গোলাম’ শব্দটি আরবী ও ফারসী উভয় ভাষায় একই রকম লেখা হয় এবং একইভাবে উচ্চারণ করা হয়। কিন্তু আরবীতে এর অর্থ হলো কিশোর আর ফারসীতে এর অর্থ হলো দাস।

সার কথা হলো, ‘বারায়াত’ শব্দটিকে আরবী শব্দ ধরা হলে এর অর্থ সম্পর্কচ্ছেদ বা মুক্তি। আর ফারসী শব্দ ধরা হলে অর্থ হবে সৌভাগ্য। আল-কুরআনে শবেবরাতের কোনো উল্লেখ নেই। শবেবরাত বলুন আর লায়লাতুল বারায়াত বলুন কোনো আকৃতিতে শব্দটি কুরআন মাজীদে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

শবেবরাত নামটি হাদীছে কোথাও উল্লেখ আছে কি?

প্রশ্ন থেকে যায়, হাদীছে কি লায়লাতুল বরায়াত বা শবেবরাত নেই? সত্যিই হাদীছের কোথাও আপনি শবেবরাত বা লায়লাতুল বারায়াত নামের কোনো রাতের নাম খুঁজে পাবেন না। যে সকল হাদীছে এ রাতের কথা বলা হয়েছে তার ভাষা হলো ‘লায়লাতুন নিছফ মিন শা‘বান’ অর্থাৎ মধ্য শা‘বানের রাত্রি। শবেবরাত বা লায়লাতুল বারায়াত শব্দ আল-কুরআনে নেই; রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর হাদীছেও নেই। এটা মানুষের বানানো একটা শব্দ। ভাবলে অবাক লাগে যে, একটি বানোয়াট প্রথা ইসলামের নামে ভারতবর্ষে শত শত বছর ধরে পালন করা হচ্ছে অথচ এর আলোচনা আল-কুরআনে নেই; ছহীহ হাদীছেও নেই। অথচ আপনি দেখতে পাবেন যে, সামান্য নফল আমলের ব্যাপারেও হাদীছের কিতাবে এক একটি অধ্যায় বা শিরোনাম লেখা হয়েছে।

ফিক্বহের কিতাবে শবেবরাত :

শবেবরাতের কথা শুধু আল-কুরআনে কিংবা ছহীহ হাদীছে নেই এমন না, বরং আপনি ফিক্বহের নির্ভরযোগ্য কিতাবগুলো পড়ে দেখুন, কোথাও শবেবরাত নামের কিছু পাবেন না। বাংলাদেশসহ ভারত উপমহাদেশে দ্বীনী মাদরাসাগুলোতে ফিক্বহের যে সিলেবাস রয়েছে যেমন মা-লা-বুদ্দা মিনহু, নূরুল ইযাহ, কুদূরী, কানযুদ দাকায়েক, শরহে বেকায়া ও হেদায়াহ খুলে দেখুন! কোথাও শবেবরাত নামের কিছু পাওয়া যায় কিনা! অথচ আমাদের পূর্বসূরী ফিক্বহবিদগণ ইসলামের অতি সামান্য বিষয়গুলো আলোচনা করতেও কোনো ধরনের কার্পণ্য দেখাননি। তারা সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণের ছালাত সম্পর্কেও অধ্যায় রচনা করেছেন। অনুচ্ছেদ তৈরি করেছেন কবর যিয়ারতের মতো বিষয়েরও। শবেবরাতের ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহর সামান্যতম ইশারা থাকলেও ফিক্বহবিদগণ এর আলোচনা, মাসআলা-মাসায়েল অবশ্যই বর্ণনা করতেন।

অতএব, এ রাতকে শবেবরাত বা লায়লাতুল বারায়াত অভিহিত করা মানুষের বানানো একটি বিদআত, যা কুরআন বা হাদীছ দ্বারা সমর্থিত নয়।

শবেবরাত সম্পর্কিত প্রচলিত আক্বীদা ও আমল :

শবেবরাত যারা পালন করেন, তারা শবেবরাত সম্পর্কে যে সকল ধারণা পোষণ করেন ও এটাকে উপলক্ষ্য করে যে সকল কাজ করে থাকেন, তার কিছু নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

তারা বিশ্বাস করে যে, শবেবরাতে আল্লাহ তাআলা সকল প্রাণীর এক বছরের রিযিক্ব বরাদ্দ করে থাকেন। এই বছর যারা মারা যাবে ও যারা জন্ম নিবে, তাদের তালিকা তৈরি করা হয়। এ রাতে বান্দার পাপ ক্ষমা করা হয়। এ রাতে ইবাদত-বন্দেগী করলে সৌভাগ্য অর্জিত হয়। এ রাতে কুরআন মাজীদ লাওহে মাহফূয হতে প্রথম আকাশে নাযিল করা হয়েছে। এ রাতে গোসল করাকে ছওয়াবের কাজ মনে করা হয়। মৃত ব্যক্তিদের রূহ এ রাতে দুনিয়ায় তাদের সাবেক গৃহে আসে। এ রাতে হালুয়া রুটি তৈরি করে নিজেরা খায় ও অন্যকে দেওয়া হয়। বাড়িতে বাড়িতে মীলাদ পড়া হয়। আতশবাজি করা হয়। সরকারি-বেসরকারি ভবনে আলোকসজ্জা করা হয়। সরকারি ছুটি পালিত হয়। পরের দিন ছিয়াম পালন করা হয়। কবরস্থানগুলো আগরবাতি ও মোমবাতি দিয়ে সজ্জিত করা হয়। লোকজন দলে দলে কবরস্থানে যায়। মাগরিবের পর

* পিএইচডি গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

থেকে মসজিদগুলো লোকে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। যারা পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে ও জুমআয় মসজিদে আসে না, তারাও এ রাতে মসজিদে আসে। মসজিদগুলোতে মাইক চালু করে ওয়ায-নছীহত করা হয়। শেষ রাতে সমবেত হয়ে দু'আ-মুনাজাত করা হয়। বহু লোক এ রাতে ঘুমানোকে অন্যায় মনে করে থাকে। নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ১২ রাকআত থেকে শুরু করে ১০০ রাকআত এমনকি হাজার রাকআত ইত্যাদি নফল ছালাত আদায় করা হয়!

লোকজন ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করে, 'হুজুর! শবেবরাতের ছালাতের নিয়ম ও নিয়্যতটা একটু বলে দিন।' ইমাম সাহেব আরবী ও বাংলায় নিয়্যত বলে দেন। কীভাবে ছালাত আদায় করবে, কোন রাকআতে কোন সূরা তেলাওয়াত করবে তাও বলে দিতে আমাদের সম্মানিত আলেম নামধারী ইমামগণ কৃপণতা করেন না। আর যদি এ রাতে কোনো ইমাম সাহেব বা মুআযযিন সাহেব কোনো মসজিদে অনুপস্থিত থাকেন, তাহলে তাদের চাকরি যাওয়ার উপক্রম হয়!

একটি বিষয় হলো, শবেবরাত সম্পর্কে যে সকল ধর্মবিশ্বাস বা আক্বীদা পোষণ করা হয়, তা কিন্তু কোনো দুর্বল হাদীছ দ্বারাও প্রমাণিত হয় না। যেমন ভাগ্যলিপি ও বাজেট প্রণয়নের বিষয়টি। যারা বলেন, আমলের ফযীলতের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীছ গ্রহণ করা যায়। অতএব এর উপর ভিত্তি করে শবেবরাতে আমল করা যায়। তাদের কাছে আমার প্রশ্ন, তাহলে শবেবরাতের আক্বীদা সম্পর্কে কি দুর্বল হাদীছেরও দরকার নেই?

শবেবরাত শুধু আমলের বিষয় নয়; আক্বীদারও বিষয়। ১৫ শা'বান রাতে শবেবরাত সম্পর্কে এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ তাআলা এ রাতে আল-কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, তিনি এ রাতে মানুষের হায়াত, রিযিক্ব ও ভাগ্যের ফয়ছালা করে থাকেন, এ রাতে ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত হলে আল্লাহ হায়াত ও রিযিক্ব বাড়িয়ে সৌভাগ্যশালী করেন ইত্যাদি আক্বীদা কি আল্লাহ রব্বুল আলামীনের প্রতি মিথ্যা আরোপ করার মতো অন্যায় নয়? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ 'তার চেয়ে বড় যালেম আর কে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে?' *(আছ-ছফ, ৬১/৭)*।

মধ্য শা'বানের রজনি সম্পর্কিত হাদীছসমূহ পর্যালোচনার সারকথা :

১৫ শা'বানের রজনির ফযীলত সম্পর্কিত হাদীছসমূহের একটি হাদীছও ছহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়নি। মধ্য শা'বানের রজনি সম্পর্কিত হাদীছসমূহ পর্যালোচনার সারকথা হলো, ১৫ শা'বান সম্পর্কে যত হাদীছ আছে, তাতে শবেবরাত হিসাবে এ রাতকে কথিত লায়লাতুল বারায়াত বা ক্বদরের রাত হিসেবে সাব্যস্ত করার কোনো দলীল নেই।

শবেবরাত সম্পর্কিত হাদীছের কোনো একটি দ্বারাও প্রমাণিত হয়নি যে, ১৫ শা'বানের রাতে আল্লাহ তাআলা আগামী এক বছরে যারা ইন্তেকাল করবে, যারা জন্মগ্রহণ করবে, কে কী খাবে সেই ব্যাপারে ফয়ছালা করেন। যদি থাকেও তাহলে তা আল-কুরআনের বক্তব্যের বিরোধী হওয়ায় গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আল-কুরআনের স্পষ্ট কথা হলো, এ বিষয়গুলোর ফয়ছালা হয় লায়লাতুল ক্বদরে। এ সকল হাদীছের কোথাও বলা হয়নি যে, এ রাতে মৃত ব্যক্তিদের আত্মা তাদের গৃহে আসে। বরং এটি একটি প্রচলিত বানোয়াট কথা। মৃত ব্যক্তির আত্মা কোনো কোনো সময় গৃহে ফিরে আসার ধারণাটা হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাস। এ সকল হাদীছের কোথাও একথা নেই যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ ও ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লা-হু আনহুম এ রাতে গোসল করেছেন, মসজিদে উপস্থিত হয়ে নফল ছালাত আদায় করেছেন, যিকির-আযকার করেছেন, কুরআন তেলাওয়াত করেছেন, সারা রাত জাগ্রত থেকেছেন, ওয়ায-নছীহত করেছেন কিংবা অন্যদের এ রাতে ইবাদত-বন্দেগীতে উৎসাহিত করেছেন অথবা শেষ রাতে জামাআতের সাথে সম্মিলিত দু'আ-মুনাজাত করেছেন। এ হাদীছসমূহের কোথাও একথা নেই যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বা ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লা-হু আনহুম এ রাতে সাহারী খেয়ে পরের দিন ছিয়াম পালন করেছেন। আলোচিত হাদীছসমূহে কোথাও একথা নেই যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বা ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লা-হু আনহুম বা খুলাফায়ে রাশেদীন বা তাবেঈন বা তাবে-তাবেঈন বা ইমামগণ কেউ এ রাতে হালুয়া-রুটি বা ভালো খানা তৈরি করে বিলিয়েছেন, বাড়িতে বাড়িতে যেয়ে মীলাদ পড়েছেন। এ সকল হাদীছের কোথাও নেই যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বা ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লা-হু আনহুম এ রাতে দলে দলে কবরস্থানে গিয়ে কবর যিয়ারত করেছেন কিংবা কবরে মোমবাতি জ্বালিয়েছেন। এমনকি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর যুগ বাদ দিলে খুলাফায়ে রাশেদীনের ৩০ বছরের ইতিহাসেও কি এর কোনো একটা আমল পাওয়া যাবে?

যদি না যায়, তাহলে শবেবরাত সম্পর্কিত এ সকল আমল ও আক্বীদা কি বিদআত নয়? এ বিদআত সম্পর্কে উম্মাতে মুহাম্মাদীকে সতর্ক করার দায়িত্ব কারা পালন করবেন? এ দায়িত্ব পালন করতে হবে আলেম-উলামার, দ্বীন প্রচারক, মসজিদের ইমাম ও খত্বীবদের। যে সকল বিষয়ে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ইশারা নেই, সে সকল আমল থেকে সাধারণ মুসলিম সমাজকে বিরত রাখার দায়িত্ব পালন করতে হবে নবী-রাসূলগণের উত্তরসূরী সম্মানিত আলেমদের।

সৌভাগ্য রজনি ধর্ম বিকৃতির শামিল :

দ্বীন ইসলামে সৌভাগ্য রজনি বলতে কিছু নেই। নিজেদের সৌভাগ্য রচনার জন্য কোনো অনুষ্ঠান বা ইবাদত-বন্দেগী

ইসলামে অনুমোদিত নয়। শবেবরাতকে সৌভাগ্য রজনি বলে বিশ্বাস করা একটি বিদআত তথা ধর্মে বিকৃতি ঘটানোর শামিল। এ ধরনের বিশ্বাস হিন্দু ধর্ম থেকে এসেছে। তারা সৌভাগ্য লাভের জন্য গনেশপূজাসহ আরো কত কী করে থাকে!

সৌভাগ্য অর্জন করতে হলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ করতে হবে। কুরআন-সুন্নাহ বাদ দিয়ে এবং সারা জীবন ছালাত-ছিয়াম-যাকাত ত্যাগ করে শুধু একটি রাতে মসজিদে উপস্থিত হয়ে রাত জেগে ভাগ্য বদল করে সৌভাগ্য হাছিল করে নিবেন এমন ধারণা ইসলামে একটি হাস্যকর ব্যাপার। নবী করীম ﷺ-এর মৃত্যুর পর যে সমস্ত নতুন আচার-অনুষ্ঠান, কাজ ও বিশ্বাস ধর্মের আচার বলে চালিয়ে দেওয়া হবে, তা সবগুলো প্রত্যাখ্যাত বিদআত বলেই পরিগণিত হবে, তার প্রচলনকারী যে কেউ হোক না কেন এবং উদ্দেশ্য যত মহৎই হোক না কেন। ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লা-হু আনহুম ও তাদের পরবর্তী উলামায়ে ইসলাম এ ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন বলে তারা বিদআতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন ও বিদআতের ব্যাপারে অন্যদের সতর্ক করেছেন।

এ ধারাবাহিকতায় উলামায়ে কেরাম মধ্য শা'বানের রাত উদযাপন ও ওই দিন ছিয়াম পালন করাকে বিদআত বলেছেন। কারণ এ বিষয়ের উপর ভিত্তি করে আমল করা যেতে পারে এমন কোনো দলীল নেই। যা আছে, তা হলো কিছু দুর্বল হাদীছ- যার উপর ভিত্তি করে আমল করা যায় না। উক্ত রাতে ছালাত আদায়ের ফযীলতের যে সকল হাদীছ পাওয়া যায়, তা বানোয়াট। এ ব্যাপারে হাফেয ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ তার কিতাব 'লাতায়েফুল মাআরেফ'-এ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

সুধী পাঠক! শবেবরাত এমনই একটা বিষয়, যা আমরা ভারত উপমহাদেশের লোকেরা মহা ধুমধামে উদযাপন করছি, কিন্তু অন্য এলাকার মুসলিমদের কাছে এ সম্পর্কে কোনো খবর নেই। কী আশ্চর্য! এমন এক মহা নিয়ামত যা মক্কা-মদীনার লোকেরা, অন্য আরবরা, আফ্রিকানরা, ইন্দোনেশীয়, মালয়েশিয়ানরা, ইউরোপ-আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়ানরা মহাদেশের লোকেরা পেল না; অথচ ভাগ্যক্রমে সৌভাগ্যের মহান রাত পেয়ে গেলাম আমরা ভারতবর্ষের কিছু লোকেরা ও শীআ মতাবলম্বীরা!

শবেবরাত সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করার দায়িত্ব উলামায়ে কেরামের :

ইসলাম ধর্মে যতগুলো বিদআত চালু হয়েছে তা কিন্তু সাধারণ মানুষ বা কাফের-মুশরিকদের মাধ্যমে প্রসার ঘটেনি। এটার প্রসারের জন্য দায়ী যেমন এক শ্রেণি আলেম, তেমনি উলামায়ে কেরামই যুগে যুগে বিদআতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, নির্যাতন সহ্য করেছেন, দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন, জেল-যুলম বরদাশত করেছেন।

তাই বিদআত যে নামেই প্রতিষ্ঠা লাভ করুক না কেন, এটার বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রাম করতে হবে আলেমদেরকেই। তারা যদি এটা না করে কারো অন্ধ অনুসরণ বা অনুকরণ করেন, বিভ্রান্তি ছড়ান বা কোনো বিদআতী কাজ-কর্ম প্রসারে ভূমিকা রাখেন, তাহলে এ জন্য তাদেরকে আল্লাহর সম্মুখে জবাবদিহি করতে হবে। যে দিন বলা হবে, ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾ 'আর সে দিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা রাসূলদের আহ্বানে কীভাবে সাড়া দিয়েছিলে?' *(আল-ক্বাছাছ, ২৮/৬৫)*। সেদিন তো এ প্রশ্ন করা হবে না যে, তোমরা অমুক পীরের মত অনুযায়ী বা অমুক ইমামের মত অনুযায়ী আমল করেছিলে কিনা। সুতরাং যারা ছহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করবে তারাই সেদিন সফলকাম হবে।

একটি বিভ্রান্তির নিরসন :

১৫ শা'বানে দিনের ছিয়াম ও রাতের ইবাদত-বন্দেগী, কুরআন তেলাওয়াত, নফল ছালাত, কান্নাকাটি, দু'আ-মুনাজাত, কবর যিয়ারাত, দান-ছাদাক্বা, ওয়ায-নছীহত প্রভৃতি নেক আমল গুরুত্ব সহকারে পালন করাকে যখন কুরআন ও হাদীছসম্মত নয় বলে আলোচনা করা হয়, তখন সাধারণ ধর্মপ্রাণ ভাই-বোনদের পক্ষ থেকে একটি প্রশ্ন আসে যে, জনাব! আপনি শবেবরাতে উল্লিখিত ইবাদত-বন্দেগীকে বিদআত বা কুরআন ও সুন্নাহসম্মত নয় বলেছেন, কিন্তু ছিয়াম পালন করা ছওয়াবের কাজ ও রুটি তৈরি করে গরীব দুঃখীকে দান করা ভালো কাজ নয় কি? আমরা কান্নাকাটি করে আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে দোষের কী?

সুধী পাঠক! নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দু'আ-মুনাজাত, ছালাত, ছিয়াম, দান-ছাদাক্বা, কুরআন তেলাওয়াত, রাত্রি জাগরণ হলো নেক আমল। এতে কারও দ্বিমত নেই। আমরা কখনো এগুলোকে বিদআত বলি না। উম্মাতে মুহাম্মাদী প্রতিদিনই রাতের শেষ ভাগে এ সকল নফল ইবাদত অধিক ছওয়াব লাভের আশায় আল্লাহকে রাযী-খুশী করানোর জন্য আর রাসূল ﷺ-এর শাফাআত লাভ করে জান্নাতবাসী হওয়ার জন্য করতে পারেন। কিন্তু যাকে বিদআত বলি এবং যে সম্পর্কে উম্মাহকে সতর্ক করতে চাই, তা হলো ১৫ শা'বান রাতকে শবেবরাত বা সৌভাগ্য রজনি অথবা মুক্তি রজনি মনে করে বিভিন্ন প্রকার আমল ও ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে দিবসটি উদযাপন করা। এটা কুরআন ও সুন্নাহ পরিপন্থী। এটাই ধর্মে বাড়াবাড়ি। যা ধর্মে নেই, তা উদযাপন করা ও প্রচলন করার নাম বিদআত।

(প্রবন্ধটির বাকী অংশ ৩৩নং পৃষ্ঠায়)

শা‘বান মাসে নফল ছিয়াম ও ছালাত

*-মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন**

শা‘বান আরবী বছরের অষ্টম মাস। বছরে মাসের সংখ্যা ও গণনা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে বলেন, ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ ‘নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিন হতেই আল্লাহর বিধানে আল্লাহর নিকট মাস গণনায় বারোটি মাস, তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস, এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। সুতরাং এটার মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি যুলম করো না এবং তোমরা মুশরিকদের সাথে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করবে, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করে থাকে। আর জেনে রাখো, আল্লাহ তো মুত্তাক্বীদের সঙ্গে আছেন’ *(আত-তওবাহ, ৯/৩৬)*।

শা‘বান মাসটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি মাস। শা‘বান মাস মাহে রামাযানের আগমনী বার্তা ঘোষণা করে। অধিক ছিয়ামের মধ্য দিয়ে রামাযান মাসের ফরয ছিয়াম পালনের অনুশীলন এবং সাহস সঞ্চয়ের মাস মাহে শা‘বান। এ মাসের বিশেষ মর্তবাও স্বীকৃত রয়েছে। উমামা ইবনু যায়েদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَمْ أَرَكَ تَصُوْمُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُوْرِ مَا تَصُوْمُ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ ذٰلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيْهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِيْ وَأَنَا صَائِمٌ ‘আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! শা‘বান মাসের মতো এত অধিক ছিয়াম (নফল) অন্য মাসে আমি আপনাকে রাখতে দেখি না কেন? তিনি বলেন, রজব ও রামাযানের এটি মাঝখানের মাস যাতে লোকেরা গাফেল থাকে। এটি এমন মাস যাতে রব্বুল আলামীনের কাছে আমলসমূহ উঠানো হয়। তাই আমি পছন্দ করি ছিয়াম রাখা অবস্থায় আমার আমল উঠানো হোক’।[১]

একটি নফল ছিয়াম মুমিন ব্যক্তিকে বাঁচানোর মযবূত হাতিয়ার। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا ‘যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর রাস্তায় এক দিন ছিয়াম রাখবে, আল্লাহ তাআলা তার চেহারাকে জাহান্নাম হতে ৭০ বছরের দূরত্ব করে দিবেন’।[২]

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এই মাসে সবচেয়ে বেশি নফল ছিয়াম পালন করতেন। রজব মাস ইবাদতের মাধ্যমে মনের ভূমি কর্ষণের জন্য, শা‘বান মাস আরও বেশি ইবাদতের মাধ্যমে মনের জমিতে বীজ বপনের জন্য আর রামাযান সর্বাধিক ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে সফলতার ফসল তোলার জন্য। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) থেকে বহু ছহীহ হাদীছে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি শা‘বান মাসে সবচেয়ে বেশি ছিয়াম রাখতেন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَصُوْمُ حَتَّى نَقُوْلَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُوْلَ لَا يَصُوْمُ وَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِيْ شَعْبَانَ.

আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) একাধারে ছিয়াম রাখা শুরু করতেন, এমনকি আমরা বলাবলি করতাম, তিনি (হয়তো আর) ছিয়াম পরিত্যাগ করবেন না। আবার তিনি ছিয়াম রাখা বন্ধ করতেন। তখন আমরা মনে মনে বলতাম, তিনি হয়তো আর ছিয়াম রাখবেন না। আমি নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে রামাযান মাস ব্যতীত অন্য কোনো মাসে পূর্ণ মাস ছিয়াম রাখতে এবং শা‘বান মাস ব্যতীত অন্য কোনো মাসে এত বেশি (নফল) ছিয়াম রাখতে দেখিনি।[৩] অন্য এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ يَصُوْمُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ كُلَّهُ وَكَانَ يَقُوْلُ خُذُوْا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُوْنَ فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوْا وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَا دُوْوِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّتْ وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوَمَ عَلَيْهَا.

আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) শা‘বান মাসের ন্যায় এত বেশি (নফল) ছিয়াম আর কোনো মাসে রাখতেন না। তিনি শা‘বান মাস (প্রায়) পুরোটাই ছিয়াম রাখতেন। তিনি সকলকে এ হুকুম দিতেন যে, তোমরা যতদূর আমলের সামর্থ্য রাখ, ঠিক

* শিবগঞ্জ, বগুড়া।

১. আবূ দাঊদ, নাসাঈ, হা/২৩৫৭, হাদীছ হাসান; আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/৪২৫।

২. ছহীহ বুখারী, হা/২৮৪০, ছহীহ মুসলিম, হা/১১৫৩।

৩. ছহীহ বুখারী, হা/১৯৬৯।

ততটুকুই করো। আল্লাহ (ছওয়াব দানে) অপারগ নন, যতক্ষণ না তোমরা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে সবচেয়ে প্রিয় হলো এমন ছালাত যা সর্বদা আদায় করা হয়, পরিমাণে তা যত কমই হোক না কেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অভ্যাস ছিল যখন তিনি কোনো (নফল) ছালাত পড়তেন, পরবর্তীতে তা জারী রাখতেন।[৪]

শা'বানের মধ্যরাত্রির পরদিন ছিয়াম রাখা : যদি কেউ শা'বান মাসে ছিয়াম রাখেন, তবে তা হবে সুন্নাত। শা'বান মাসের শেষ দিন ছাড়া বাকী যে কোনো দিন ছিয়াম রাখা জায়েয বা ছওয়াবের কাজ। তবে ছিয়াম রাখার সময় মনে করতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেহেতু শা'বান মাসে ছিয়াম পালন করেছিলেন তাকে অনুসরণ করে ছিয়াম রাখা হচ্ছে। অথবা যদি কারও আইয়ামে বীযের নফল ছিয়াম তথা মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ এ তিন দিন ছিয়াম রাখার নিয়ম থাকে, তিনিও ছিয়াম রাখতে পারেন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ أَوْصَانِيْ خَلِيْلِيْ ﷺ بِثَلَاثٍ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ.

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার প্রিয় বন্ধু রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তিনটি বিষয়ের উপদেশ দিয়ে গেছেন- (১) আমি যেন প্রতি মাসে (১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে) তিনটি ছিয়াম রাখি, (২) চাশতের সময় দু'রাকআত ছালাত পড়ি, (৩) রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগেই বিতরের ছালাত আদায় করি।[৫]

কিন্তু শুধু শা'বানের ১৫ তারিখ ছিয়াম রাখা বিদআত হবে। কারণ শরীআতে এ ছিয়ামের কোনো ভিত্তি নেই।

অর্ধ শা'বানের পর ছিয়াম রাখা : আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فَلاَ تَصُومُوا 'শা'বান মাস অর্ধেক হয়ে গেলে তোমরা ছিয়াম রাখিয়ো না'।[৬] এই হাদীছের অর্থ হলো যে ব্যক্তি শা'বান মাসের প্রথম থেকে ছিয়াম রাখেনি সে যেনো অর্ধ শা'বানের পর আর ছিয়াম শুরু না করে। তবে যে ব্যক্তি শা'বান মাসের শুরু থেকে ছিয়াম রেখেছে বা যার উপর গত বছরের ছিয়াম ক্বাযা আছে অথবা যার প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম রাখা অভ্যাস সেও ১৫ তারিখের পর রাখতে পারে।

অর্ধ শা'বানের ছালাত : অর্ধ শা'বানের রাতের ছালাতের প্রথম প্রচলন হয় হিজরী ৪৪৮ সনে। ফিলিস্তীনের নাবলুস শহরের ইবন আবিল হামরা নামক এক লোক বায়তুল মুক্বাদ্দাস আসেন। তার তেলাওয়াত ছিল সুমধুর। তিনি শা'বানের মধ্যরাত্রিতে ছালাতে দাঁড়ালে তার পিছনে এক লোক এসে দাঁড়ায়, তারপর তার সাথে তৃতীয় জন এসে যোগ দেয়, তারপর চতুর্থ জন। তিনি ছালাত শেষ করার আগেই বিরাট একদল লোক এসে তার সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। পরবর্তী বছর এলে তার সাথে অনেকেই যোগ দেয় ও ছালাত আদায় করে। এতে করে মাসজিদুল আক্বছাতে এ ছালাতের প্রথা চালু হয়। কালক্রমে এ ছালাত এমনভাবে আদায় হতে লাগে যে অনেকেই তা সুন্নাত মনে করতে শুরু করে।[৭] প্রথা অনুযায়ী এ ছালাতের পদ্ধতি হলো, প্রতি রাকআতে সূরা ফাতেহার পর সূরা ইখলাছ ১০ বার করে পড়ে মোট ১০০ রাকআত ছালাত পড়া। যাতে করে সূরা ইখলাছ ১০০০ বার পড়া হয়।[৮]

মিশকাতের ভাষ্যকার মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (মৃ. ১০১৪ হি.) বলেন, জেনে রাখো যে, ইমাম সুয়ূত্বী (৮৪৯-৯১১ হি.) তার কিতাবে দায়লামী ও অন্যদের আনীত হাদীছসমূহ যেখানে মধ্য শা'বানে প্রতি রাকআতে ১০ বার করে সূরা ইখলাছসহ ১০০ রাকআত ছালাতের যে অগণিত ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, তা সবই মাওযূ'। তাছাড়া আলী ইবনু ইবরাহীম কোনো এক পুস্তিকায় বলেছেন, মধ্য শা'বানের রাত্রিতে ছালাতে আলফিয়্যাহ নামে প্রতি রাকআতে ১০ বার করে সূরা ইখলাছসহ ১০০ রাকআত ছালাত জামাআত সহকারে যা আদায় করা হয় এবং যাকে লোকেরা জুমআ ও ঈদায়নের চাইতে গুরুত্ব দিয়ে আদায় করে থাকে, সে বিষয়ে যঈফ বা মাওযূ' ব্যতীত কোনো হাদীছ বা আছার বর্ণিত হয়নি।[৯]

এ ধরনের ছালাত সম্পূর্ণ বিদআত। কারণ এ ধরনের ছালাতের বর্ণনা কোনো হাদীছের কিতাবে আসেনি।

---

৪. ছহীহ বুখারী, হা/১৯৭০।

৫. ছহীহ বুখারী, হা/১৯৮১।

৬. ইবনু মাজাহ, হা/ ১৬৫১; তিরমিযী, হা/৭৩৬; ইমাম তিরমিযী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীছটি হাসান ছহীহ।

৭. ত্বরতুসী, হাওয়াদেছ ও বিদআহ, পৃ. ১২১, ১২২; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৪/২৪৭।

৮. ইমাম গাযালী, এহইয়ায়ে উলূমুদ্দীন, ১/২০৩।

৯. মিরক্বাত (দিল্লী ছাপা : তা.বি.), ৩/১৯৭।

কোনো কোনো বইয়ে এ সম্পর্কে যে সকল হাদীছ উল্লেখ করা হয়, সেগুলো কোনো হাদীছের কিতাবে আসেনি। আর তাই আল্লামা ইবনুল জাওযী,[১০] ইমাম নববী,[১১] আল্লামা আবূ শামাহ,[১২] শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়্যা,[১৩] আল্লামা ইবনু আররাক,[১৪] আল্লামা সুয়ূত্বী,[১৫] আল্লামা শাওকানী,[১৬]সহ আরো অনেকেই এগুলোকে 'বানোয়াট হাদীছ' বলে সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন। ১০০ রাকআত ছালাত পড়া সংক্রান্ত সমস্ত হাদীছই জাল বা বানাওয়াট। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কিছুই প্রমাণিত নেই।[১৭]

১০০ রাকআত ছালাত পড়ার বিদআতটি মসজিদের মূর্খ ইমামগণ অন্যান্য ছালাতের সঙ্গে যুক্ত করে এই ছালাত চালু করেন। এর মাধ্যমে তারা জনসাধারণকে একত্রিত করার এবং তাদের উপর সর্দারী করা ও পেটপূর্তি করার একটি ফন্দী এঁটেছিল মাত্র। এই বিদআতী ছালাতের ব্যাপক জনপ্রিয়তা দেখে নেক্কার, পরহেযগার ব্যক্তিগণ আল্লাহর গযবে যমীন ধ্বসে যাওয়ার ভয়ে শহর ছেড়ে জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিলেন।[১৮]

১০. কিতাবুল মাওযূআত, ১/১২৭-১৩০।
১১. আল-মাজমূ', ৪/৫৬।
১২. আল-বায়স, পৃ. ৩২-৩৬।
১৩. ইক্বতিদায়ে ছিরাতুল মুস্তাক্বীম, ২/৬২৮।
১৪. তানযীহুশ শরীআহ, ২/৯২।
১৫. আল-আমর বিল ইত্তেবা, পৃ. ৮১; আল-লাআলিল মাসনূআ, ২/৫৭।
১৬. ফাওয়ায়েদুল মাজমূআ, পৃ. ৫১।
১৭. আল্লাআলিল মাসনূআহ, আহকাম রজব ও শা'বান, পৃ. ৪৩।
১৮. মিরক্বাত (দিল্লী : তাবি), 'ক্বিয়ামু শাহরে রামাযান' অধ্যায়, টীকা সংক্ষেপায়িত, ৩/১৯৭-১৯৮।

শায়খ ইবনে বায রহিমাহুল্লাহ বলেন, এই রাতে মসজিদে গিয়ে একাকী বা জামাআতবদ্ধভাবে ছালাত আদায় করা, যিকির-আযকারে লিপ্ত হওয়া সম্পর্কে জানা যায় যে, শামের কিছু বিদ্বান এটি প্রথম শুরু করেন। তারা এই রাতে সুন্দর পোশাক পরে ও আতর-সুরমা লাগিয়ে মসজিদে গিয়ে রাত্রি জাগরণ করতে থাকেন। পরে বিষয়টি লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। মক্কা-মদীনার আলেমগণ এর তীব্র বিরোধিতা করেন। কিন্তু শামের বিদ্বানদের দেখাদেখি কিছু লোক এগুলো করতে শুরু করে। এইভাবে এটি জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।[১৯]

শা'বানের ছিয়াম পালনের মাধ্যমে রামাযানের ছিয়াম পালনের অনুশীলন হয় এবং ছিয়াম রাখার অভ্যাস ও স্বাভাবিকতা সৃষ্টি হয়। উৎসাহ ও আনন্দও বৃদ্ধি পায়। ফলে রামাযান মাসে ছিয়াম পালনে কষ্ট অনুভব হয় না। তাই পবিত্র রামাযানের ছিয়াম সাধনা শুরু করার আগে শা'বান মাসে কিছু নফল ছিয়াম রেখে রামাযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। যাতে করে রামাযানের ছিয়াম পালন সহজসাধ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যময় হয়।

মানুষের অসৎ প্রবৃত্তি দমনের জন্য ছিয়াম হলো সবচেয়ে মহৎ ফর্মুলা। শা'বান মাসে ছিয়াম পালনের মাধ্যমে মুমিন তার প্রবৃত্তিকে পরিচ্ছন্ন করে রামাযানের ছিয়াম পালনের উপযোগী করে তুলবে এটাই এ মাসের ছিয়ামের তাৎপর্য।

১৯. শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, আত-তাহযীরু মিনাল বিদা' (মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় : ১৩৯৬ হি.), পৃ. ১২-১৩।

দারুল ফোরকান হিফয্ মাদ্‌রাসা

আসলাম খাঁন ম্যানশন(গ্রীন স্কুল ফেনী বিল্ডিং), পাঠান বাড়ি, ফেনী।
মোবাইলঃ ০১৬৩০৪৫৪৫৯১,০১৮৬৯৫৬৯৭১৭ E-mail: darulforkanhifjmadrasha@gmail.com

হাফেজ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

পদের নাম	সংখ্যা	বেতন
হাফেজ	৩	১২ হাজার থেকে ১৮ হাজার টাকা (আলোচনা সাপেক্ষে)

- অভিজ্ঞ প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
- যোগাযোগ: ০১৬৩০-৪৫৪৫৯১, ০১৮৬৯-৫৬৯৭১৭
- আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা: আসলাম খাঁন ম্যানশন (গ্রীন স্কুল ফেনী বিল্ডিং),পাঠান বাড়ি, ফেনী।
- E-mail: darulforkanhifjmadrasha@gmail.com

নিবেদক
মোহতামিম
দারুল ফোরকান হিফয্ মাদ্রাসা
আসলাম খাঁন ম্যানশন, পাঠান বাড়ি, ফেনী।

চিন্তা ও উৎকণ্ঠা দূর করা

*[৪ জুমাদাল আখেরাহ, ১৪৪৩ হি. মোতাবেক ৭ জানুয়ারি, ২০২২। মদীনা মুনাওয়ারার মসজিদে নববীতে জুমআর খুৎবা প্রদান করেন **শায়খ আব্দুল বারী আছ-ছুবায়তী** হাফিযাহুল্লাহ। উক্ত খুৎবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহীর সম্মানিত সিনিয়র শিক্ষক **শায়খ মাহবূবুর রহমান মাদানী।** খুৎবাটি **'মাসিক আল-ইতিছাম'**-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]*

প্রথম খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি দেশ ও বান্দাকে সাহায্য করেন। যাঁর রহমত কামনা করে উপত্যকা, পাহাড়-পর্বত নিম্নভূমি। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক তাঁর কোনো শরীক নেই। যিনি বলেন, ﴿وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ - فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ 'যদিও ইতোপূর্বে তাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণের পূর্বে তারা ছিল চরমভাবে হতাশ। অতএব আল্লাহর রহমতের ফল দেখে নাও, কীভাবে তিনি ভূমিকে তার মৃত্যুর পর জীবিত করেন' *(আর-রূম, ৩০/৪৯-৫০)*। আমি আরো সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আমাদের নেতা, আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। তার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বান্দার অন্তরগুলোকে উদ্ধার করেন। দরূদ বর্ষিত হোক তাঁর প্রতি, তাঁর পরিবার ও তাঁর ছাহাবীদের প্রতি, যারা ইতিহাস লিখেছেন পরিচ্ছন্ন কালি দ্বারা।

অতঃপর, আমি আপনাদের সকলকে সেই সাথে নিজেকেও আল্লাহভীরুতার উপদেশ দিচ্ছি, যার মাধ্যমে আর্তচিৎকারের দিন রক্ষা পাওয়া যাবে। হে আল্লাহর বান্দা! প্রত্যেক কাল বা যুগের রয়েছে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য। যার মাধ্যমে এক যুগ অন্য থেকে আলাদা হয়ে যায়। বর্তমান সময়ে মানুষজাতি শৈল্পিক ও প্রযুক্তির বিশ্বে ব্যাপক অগ্রসর হয়েছে। দূরত্ব কাছে এসেছে, অনেক কঠিন ও কষ্টের জিনিস হালকা হয়েছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে পৌঁছা সহজ হয়েছে এবং বস্তুগত জীবন বিভিন্ন লক্ষ্য পানে পৌঁছে গেছে। কিন্তু তা আত্মার তীব্র পিপাসা মিটায়নি, দুনিয়াপ্রত্যাশীকে পরিতৃপ্ত করেনি, যা তার প্রকৃতিগত স্বভাব, যার উপর আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন। ফলে আত্মা কাঁপছে ও অন্তর কঠিন হয়েছে। নির্ভরশীলতা, দৃঢ়বিশ্বাস ও সন্তুষ্টির তাৎপর্য সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। অন্তরে অনুপ্রবেশ করেছে চিন্তা ও অস্থিরতা এবং তার উপর তাঁবু গেড়েছে বিষণ্নতা। উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, চিন্তা ও অস্থিরতা এই যুগের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। আর এটা তাড়া করছে চাকরি, সন্তানাদি, সুস্থতা ও জীবিকার ব্যাপারে ভয়ের দিকে ।

ইসলাম উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, চিন্তা ও অস্থিরতার চিকিৎসা করেছে এবং এমন নীতিমালা প্রণয়ন করেছে, যা উক্ত থাবায় পতিত হওয়া থেকে উদ্ধার করবে এবং তার ছিদ্রপথ বন্ধ করে দিবে। মানুষের জীবন উৎকণ্ঠা ও চিন্তা হতে মুক্ত নয়। তাকে প্রত্যেক যাত্রায় কষ্ট ভোগ করতে হবে এবং অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ 'নিঃসন্দেহে আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে' *(আল-বালাদ, ৯০/৪)*। এমনকি নবীগণকেও তাদের চলার পথে বিভিন্ন প্রকার দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। তাদের মধ্যে কাউকে অসুস্থতা দ্বারা, কাউকে অভাব দিয়ে, কাউকে প্রিয়জনকে হারানোর মধ্য দিয়ে, কাউকে বিতাড়িত করে পরীক্ষা করা হয়েছে। আর আমাদের নবী ﷺ-কে সকল প্রকার বালা-মুছীবত দ্বারা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাই নবী ﷺ বলেন, لَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ وَلَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَالِثَةٌ وَمَا لِي وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا مَا وَارَى إِبْطُ بِلَالٍ 'আল্লাহর পথে আমাকে যতটা কষ্ট দেওয়া ও নির্যাতন করা হয়েছে, অপর কাউকে সেরূপ নির্যাতন করা হয়নি এবং আমাকে আল্লাহর পথে যতটা ভীত-সন্ত্রস্ত করা হয়েছে, অপর কাউকে সেরূপ ভীত-সন্ত্রস্ত করা হয়নি। আমার ও বেলালের উপর দিয়ে তিন তিনটি রাত এমনভাবে অতিবাহিত হয়েছে যে, বেলালের বগলের নিচে দাবিয়ে রাখা সামান্য খাদ্য ছাড়া এমন কোনো খাদ্য ছিল না, যা কোনো প্রাণী খেতে পারে'।[১] এত বিপদ ও কষ্ট সত্ত্বেও তার অন্তরে দুশ্চিন্তা প্রবেশ করতে পারেনি। তিনি অস্থিরতা অনুভব করেননি। কেননা তিনি মহান আল্লাহর প্রতিপালনে লালিতপালিত হয়েছেন। তিনি তাকে শিক্ষা দিয়েছেন, তাই তিনি শিখেছেন। তিনি প্রশস্ত অন্তর নিয়ে জীবনযাপন করেছেন। আল্লাহ বলেন,﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ 'আমি কি তোমার বক্ষদেশকে প্রসারিত করে দেইনি? সূরার শেষে আল্লাহ বলেন,﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ - وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾ 'কাজেই তুমি

১. তিরমিযী, হা/২৪৭২; ইবনু মাজাহ, হা/১৫১, হাদীছ ছহীহ।

যখনই অবসর পাবে, ইবাদতের কঠোর শ্রমে লেগে যাবে। আর তোমার রবের প্রতি গভীরভাবে মনোযোগ দিবে' *(আলাম নাশরাহ, ৯৪/১, ৭-৮)*।

দুশ্চিন্তা-বিষণ্ণতা ও উৎকণ্ঠা দূর করার উপায়সমূহ :

উৎকণ্ঠা ব্যাধির অধিকতর ফলদায়ক ওষুধ হলো ইবাদতের মুক্তাঙ্গনে জীবন পরিচালনা করা, বিভিন্ন প্রকার আনুগত্য কাজে নিজেকে ডুবিয়ে রাখা এবং ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করা। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হিজরতকালীন সময়ের ঘটনা— যখন তিনি তার সফরসঙ্গী আবূ বকর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে সঙ্গে নিয়ে মক্কা থেকে হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হলেন। এদিকে পদব্রজী ও অশ্বারোহী শত্রুরা তলোওয়ার উন্মুক্ত করে সর্বত্র তার খোঁজ করে ফিরছে। তারা আশ্রয়স্থল হিসেবে পাহাড়ের গুহা বেছে নেন। শত্রুরা গুহার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছলে আবূ বকর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) চিন্তিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন এবং তিনি রাসূল ﷺ-কে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের কেউ যদি পা উঁচিয়ে দেখে, তবে আমাদের দেখতে পাবে। কিন্তু সে সময়েও রাসূল ﷺ ছিলেন পাহাড়ের মতো অনড়, অটল ও নিশ্চিন্ত। তাই তাঁর সঙ্গীকে অভয় দিয়ে বলেছিলেন, যে দুজনের সাথে আল্লাহ তৃতীয় হিসেবে আছেন, তাদের ব্যাপারে তোমার কী ধারণা? কাজেই বিষণ্ণ হয়ো না, আল্লাহ তো আমাদের সাথে আছেন।[২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কাজ ও কথার মাধ্যমে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, কীভাবে দুঃখ, চিন্তা ও উৎকণ্ঠা দূর হবে। তিনি বেলাল (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে বলেন, يَا بِلَالُ أَقِمِ الصَّلَاةَ أَرِحْنَا بِهَا 'হে বিলাল! ছালাত ক্বায়েম করো, আমরা এর মাধ্যমে স্বস্তি লাভ করতে পারব'।[৩] কোনো বিষয় তাঁকে গুরুতর করলে তিনি ছালাত আদায় করতেন। কারণ ছালাতে বিষণ্ণ ব্যক্তি তার রবের কাছে সংগোপনে বলতে পারে। আর আল্লাহ তাআলা প্রার্থনাকারীর দু'আ কবুল করেন। আল্লাহ বলেন, ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ 'কে তিনি, যিনি (নিরুপায়ের) আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন এবং কে তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন? আল্লাহর সাথে অন্য কোনো মা'বূদ আছে কি? তোমরা উপদেশ অতি সামান্যই গ্রহণ করে থাকো' *(আন-নামল, ২৭/৬২)*।

আর কীভাবে বিষণ্ণ ব্যক্তি আল্লাহর নিকট দু'আ করা হতে অমনোযোগী হতে পারে, যিনি দুর্দশাগ্রস্তদের আশ্রয়স্থল ও দুশ্চিন্তা বিদূরকারী। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ 'আল্লাহ যদি তোমাকে কষ্ট দিতে চান, তাহলে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউ নেই। আর আল্লাহ যদি তোমার কল্যাণ করতে চান, তাহলে তাঁর অনুগ্রহ প্রতিরোধক কেউ নেই। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ দিয়ে ধন্য করেন। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু' *(ইউনুস, ১০/১০৭)*। আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি দু'আ করতেন, اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالحَزَنِ وَالعَجْزِ وَالكَسَلِ وَالبُخْلِ وَالجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ অর্থ. 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি চিন্তাভাবনা, অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা, কাপুরুষতা, অধিক ঋণ এবং দুষ্ট লোকের প্রাধান্য থেকে'।[৪]

আর যে ব্যক্তি অনিচ্ছায় নয়, বরং স্বেচ্ছায় জীবনের উৎকণ্ঠার উপর ধৈর্যধারণ করবে এবং ছওয়াবের আশা করবে, তার উপর যে বিপদ এসেছিল আল্লাহ তার মিনিময়ে তাকে উত্তম প্রতিদান দিবেন। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ - أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ 'নিশ্চয় যারা বিপদকালে বলে থাকে, আমরা আল্লাহরই আর আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। এদের প্রতি রয়েছে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে অনুগ্রহ ও করুণা আর এরাই হেদায়াতপ্রাপ্ত' *(আল-বাক্বারা, ২/১৫৬-১৫৭)*।

আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীর উপর দরূদ পাঠ করাকে যিকির হিসেবে পরিণত করে তিনি তাঁর নবী ﷺ ও তাঁর উম্মতকে সম্মানিত করেছেন। আর এই যিকিরকে চিন্তা-উৎকণ্ঠা থেকে পরিত্রাণের উপায় ও সুরক্ষা বানিয়েছেন। উবাই ইবনু কা'ব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো আপনার উপর অধিকহারে দরূদ পাঠ করি। আপনার জন্য দরূদ পাঠের কতটুকু সময় খরচ করব? তিনি বলেন, তুমি যতক্ষণ ইচ্ছা কর। হাদীছের শেষ অংশে উবাই (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, তাহলে আমার পুরো সময়টাই আপনার উপর দরূদ পাঠে কাটিয়ে দিব? তিনি বললেন, 'তাহলে তোমার চিন্তা ও কষ্টের জন্য তা যথেষ্ট হবে এবং তোমার পাপসমূহ ক্ষমা করা হবে'।[৫]

২. সূরা আত-তওবা, ৯/৪০; ছহীহ বুখারী, হা/১৭৭।
৩. আবূ দাউদ, হা/৪৯৮৫, হাদীছ ছহীহ।
৪. ছহীহ বুখারী, হা/২৮৯৩।
৫. তিরমিযী, হা/২৪৫৭, হাদীছ হাসান।

আর পরকালের চিন্তা অন্তরকে প্রশস্ত করে এবং আত্মাকে প্রশান্ত করে দেয়। আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, مَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ 'যে ব্যক্তির একমাত্র চিন্তার বিষয় হবে পরকাল, আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তির অন্তরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন এবং তার যাবতীয় বিচ্ছিন্ন কাজ একত্রিত করে সুসংযত করে দিবেন, তখন তার নিকট দুনিয়াটা নগণ্য দেখা দিবে'।[৬] আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ آخِرَتِهِ كَفَاهُ اللَّهُ هَمَّ دُنْيَاهُ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُومُ فِي أَحْوَالِ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللَّهُ فِي أَيِّ أَوْدِيَتِهَا هَلَكَ 'যে ব্যক্তি তার সমস্ত চিন্তাকে একই চিন্তায় অর্থাৎ পরকালের চিন্তায় কেন্দ্রীভূত করেছে, আল্লাহ তার দুনিয়ার চিন্তার জন্য যথেষ্ট। অপর দিকে, যে ব্যক্তি যাবতীয় পার্থিব চিন্তায় নিমগ্ন থাকবে, সে যে কোনো উন্মুক্ত মাঠে ধ্বংস হোক, তাতে আল্লাহর কিছু আসে যায় না'।[৭]

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের জন্য কুরআন ও সুন্নাহতে বরকত দান করুন। আর তাতে যে পথনির্দেশনা ও বিবরণ রয়েছে, তা দ্বারা আমাদের উপকার প্রদান করুন। আর আমি নিজের ও আপনাদের এবং সকল মুসলিমের জন্য সকল প্রকার গুনাহ ও পাপ হতে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। নিশ্চয় তিনি তওবাকারীদের জন্য ক্ষমাশীল।

দ্বিতীয় খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, শুরুতে ও শেষে সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য এবং তিনিই আশ্রয়স্থল। আর আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। যিনি বলেন, ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى- وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى﴾ 'আর এই যে, মানুষ তাই পায়, যা সে চেষ্টা করে। আর এই যে, তার প্রচেষ্টার ফল শীঘ্রই দেখা যাবে' *(আন-নাজম, ৫৩/৩৯-৪০)*। আমি আরো সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আমাদের নেতা, আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তাআলা শান্তি বর্ষণ করুন তার প্রতি এবং তার পরিবার ও তার ছাহাবীগণের প্রতি। অতঃপর, আমি আপনাদের সকলকে সেই সাথে নিজেকেও আল্লাহভীরুতার উপদেশ দিচ্ছি।

আর যে জিনিস দুশ্চিন্তা দূর করবে এবং অন্তরে প্রশান্তি আনবে তা হলো :

১. আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া : রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ 'মুসলিম ব্যক্তির উপর যে কষ্ট-ক্লেশ, রোগ-ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী আসে, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে ফুটে, এসবের মাধ্যমে আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন'।[৮]

২. গরীব-অসহায়দেরকে দান ও ছাদাক্বা এবং বিপদগ্রস্তদের বিপদ দূর করা : কারণ যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের বিপদ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তাআলা তার বিপদ-কষ্ট দূর করবেন। আল্লাহ বলেন, 'যারা নিজেদের ধন-সম্পদ রাতে ও দিনে, প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে ব্যয় করে থাকে, তাদের জন্য সেই দানের ছওয়াব তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে। আর তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না' *(আল-বাক্বারা, ২/২৭৪)*।

পরিশেষে সম্মানিত খত্বীব রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি দরূদ পড়ার জন্য সকলকে উৎসাহ প্রদান করে কুরআনের একটি আয়াত পাঠ করেন, যার অর্থ হলো— নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও নবীর জন্য দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরাও নবীর উপর দরূদ পড়ো এবং তাঁর প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধাভরে সালাম জানাও *(আল-আহযাব, ৩৩/৫৬)*। এরপর দরূদে ইবরাহীম পাঠ করেন এবং চার খলীফার জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করেন। অতঃপর সারা বিশ্বের মুসলিমদের জন্য আল্লাহর নিকট শান্তি ও কল্যাণ কামনা করে খুৎবা শেষ করেন।

৬. তিরমিযী, হা/২৪৬৫, হাদীছ ছহীহ।

৭. ইবনু মাজাহ, হা/২৫৭, হাদীছ হাসান।

৮. ছহীহ বুখারী, হা/৫৬৪১; ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৭৩।

AT TAQWA STORE
01575245872 @attaqwastore

بسم الله الرحمن الرحيم

খাঁটি ও নির্ভেজাল পণ্যের প্রচেষ্টায়। ইন শা আল্লাহ, আমাদের কাছে পাবেন,

- খাঁটি গাওয়া ঘি - ৬৫০ টাকা/ ৫০০ গ্রাম,
- সুন্দরবনের খলিশা মধু - ৪৫০ টাকা/ ৫০০ গ্রাম,
- কালিজিরা মধু (ধনিয়া মিক্স) - ৪৫০ টাকা/ ৫০০ গ্রাম,
- লিচু ফুলের মধু - ২৭৫ টাকা/ ৫০০ গ্রাম,
- লিচু কালোজিরা মিশ্র মধু - ৩২০ টাকা/ ৫০০ গ্রাম,
- কাঠের ঘানিতে ভাঙ্গা সরিষার তেল (কোল্ড প্রেসড) - দাম জানতে কল করুন,
- সরিষার তেল (মেশিনে ভাঙ্গানো) - দাম জানতে কল করুন,
- খেজুরের গুড় (সিজনাল),
- আম (সিজনাল),
- নির্ভরযোগ্য লেখকদের ইসলামিক বই।

১৫০০+ টাকার শপিং এ সারা দেশে কুরিয়ার চার্জ ফ্রী

অর্ডার করতে কল করুন ০১৩২১৪৪৭৫৭৫, হোয়াটসঅ্যাপ ০১৫৭৫২৪৫৮৭২, ফেইসবুকে সার্চ করুন @attaqwastore
ডাঙ্গিপারা (আল জামিয়া আস-সালাফিয়্যাহ সংলগ্ন), পবা, রাজশাহী।

সবচেয়ে ভালো মানুষ কারা?

-মো. দেলোয়ার হোসেন*

আমরা সকলেই আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে চাই। হতে চাই সবচেয়ে ভালো মানুষ। কত সেলেব্রিটি, কত মোটিভেশনাল স্পিকার আমাদের ভালো মানুষ হওয়ার পথ বাতলে দেয়। সেই পথ ধরে চলতে চলতে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ি। ক্লান্ত শ্রান্ত দেহে আমরা বুঝতে পারি আসলে এগুলো ভালো মানুষ হওয়ার উপায় ছিল না মোটেই, বরং অমানুষ হওয়ার ফাঁদ ছিল। কেমন হয় যদি ভালো মানুষ হওয়ার উপায় বাতলে দেয় স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিংবা রাসূলুল্লাহ ﷺ? আলোচ্য প্রবন্ধে এই বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করা হলো—

সবচেয়ে ভালো মানুষ :

১. ঈমানদার ব্যক্তি : ঈমানদার ব্যক্তি হচ্ছে সবচেয়ে ভালো মানুষ। পক্ষান্তরে কাফের-মুশরিক হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ - إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾ ‘নিশ্চয় আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে, তারা জাহান্নামের আগুনের মধ্যে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে; তারাই সৃষ্টির নিকৃষ্ট। নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ’ *(আল-বায়্যিনাহ, ৯৮/৬-৭)*।

২. আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী : যারা মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করে, তারাই সবচেয়ে ভালো মানুষ। খোদ আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দিচ্ছেন, ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ ‘আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম, যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি অবশ্যই মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত’ *(ফুছ্ছিলাত, ৪১/৩৩)*।

৩. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকারী : সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকারী হচ্ছে সর্বোত্তম ব্যক্তি। আল্লাহ বলেন, ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ ‘তোমরাই সর্বোত্তম জাতি। মানবমণ্ডলীর জন্য তোমাদের অভ্যুত্থান হয়েছে, তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে, অসৎকাজ (করা থেকে) নিষেধ করবে, আর আল্লাহকে বিশ্বাস করবে’ *(আলে ইমরান, ৩/১১০)*।

৪. মুত্তাক্বী : মুত্তাক্বী তথা যারা আল্লাহকে ভয় করে তারা আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় মানুষ। আল্লাহ বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ ‘হে মানুষ! তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই লোক অধিক সম্মানীয়, যে অধিক মুত্তাক্বী তথা আল্লাহকে ভয় করে। আর নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী সর্বজ্ঞ’ *(আল-হুজুরাত, ৪৯/১৩)*।

৫. জ্ঞান অর্জনকারী : যারা কুরআন-হাদীছের জ্ঞান অর্জন করে, তারা সর্বোত্তম। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا ‘সোনা-রূপার খনির ন্যায় মানবজাতিও খনিবিশেষ। যারা জাহিলিয়্যাতের (অন্ধকারের) যুগে উত্তম ছিল, দ্বীনের জ্ঞান লাভ করার কারণে তারা ইসলামের যুগেও উত্তম’।[১]

৬. আল্লাহর পথে জিহাদকারী : আল্লাহর পথে জিহাদকারী ব্যক্তি হচ্ছে সর্বোত্তম ব্যক্তি। হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ رَجُلٌ مُمْسِكٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالَّذِيْ يَتْلُوْهُ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِيْ غُنَيْمَةٍ لَه يُؤَدِّيْ حَقَّ اللهِ فِيهَا أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ رَجُلٌ يُسْأَلُ بِاللهِ وَلَا يُعْطِيْ به.

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি কি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম মানুষ কে, তা বলব না? সে হলো ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহর পথে ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি কি তোমাদের ঐ ব্যক্তির মর্যাদার কাছাকাছি লোকের কথা জানাব? সেও ঐ ব্যক্তি, যে তার কিছু বকরী নিয়ে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে আল্লাহর হক্ব আদায় করতে থাকে। আমি কি তোমাদের খারাপ লোক সম্পর্কে জানাব? সে ঐ ব্যক্তি, যার কাছে আল্লাহর কসম দিয়ে চাওয়া হয়। কিন্তু সে তাকে কিছুই দেয় না।[২]

৭. কুরআন শিক্ষাকারী ও শিক্ষাদানকারী : যারা নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে সর্বোত্তম বলে ঘোষণা দিয়েছেন। উছমান ইবনু আফফান রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ‘তোমাদের

---

* আলিম ২য় বর্ষ, চরবাটা ইসমাঈলিয়া আলিম মাদরাসা, সুবর্ণচর, নোয়াখালী।

১. ছহীহ বুখারী, হা/৩৩৮৩; ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৩৮; মিশকাত, হা/২০১।

২. তিরমিযী, হা/১৬৫২, হাদীছ ছহীহ; নাসাঈ, হা/২৫৬৯; মিশকাত, হা/১৯৪১।

মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ঐ ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন শিখে ও অপরকে শিক্ষা দেয়’।[৩]

৮. যার অনিষ্ট থেকে অপর মুসলিম নিরাপদ : এ প্রসঙ্গে হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ قَالَ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرٌ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) হতে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে প্রশ্ন করলেন, মুসলিমদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, ‘যার জিহ্বা ও হাত (’র অনিষ্ট) হতে অন্য মুসলিমগণ নিরাপদে থাকে’।[৪]

৯. যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর কাছে উত্তম : যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর কাছে উত্তম, তাকে সর্বোত্তম ব্যক্তি বলে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘোষণা দিয়েছেন। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ ‘ঈমানের দিক থেকে সর্বোত্তম মুমিন তারাই, যারা চরিত্রের বিচারে উত্তম। আর তোমাদের মধ্যে যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম, সেই উত্তম।[৫]

১০. যে ব্যক্তি তার পরিবারের কাছে উত্তম : যে ব্যক্তি তার পরিবারের কাছে উত্তম, সেই সর্বোত্তম মানুষ। আমাদের প্রিয় নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজে তার পরিবারের কাছে সর্বোত্তম ছিলেন। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيْ ‘তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে স্বীয় পরিবারের নিকট উত্তম। আর আমি আমার পরিবারের নিকট সর্বোত্তম’।[৬]

১১. যে ব্যক্তি তার প্রতিবেশীর কাছে উত্তম : এই মর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَيْرُ الأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘আল্লাহর নিকট সঙ্গীদের মাঝে উত্তম সঙ্গী হলো সে ব্যক্তি, যে তার নিজ সঙ্গীর নিকট উত্তম। আল্লাহর দৃষ্টিতে প্রতিবেশীদের মাঝে উত্তম ব্যক্তি হলো সে, যে তার প্রতিবেশীর নিকট উত্তম’।[৭]

১২. উত্তমভাবে ঋণ পরিশোধকারী : যারা উত্তমভাবে মানুষের ঋণ পরিশোধ করে, তারাই সবচেয়ে ভালো মানুষ। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, إِنَّ خَيْرَكُمْ أَوْ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً ‘তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে উত্তমরূপে ঋণ পরিশোধ করে’।[৮]

১৩. প্রথমে সালাম প্রদানকারী : যারা মানুষকে প্রথমে সালাম দেয়, তারা আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি। আবূ উমামা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللهِ مَنْ بَدَأَ السَّلَامَ ‘আল্লাহ তাআলার নিকট অগ্রগণ্য সে ব্যক্তি, যে প্রথমে সালাম দেয়’।[৯]

১৪. উত্তম চরিত্রের অধিকারী : উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিই সবচেয়ে ভালো মানুষ। এ প্রসঙ্গে অনেকগুলো হাদীছ এসেছে। যেমন—

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, إِنْ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا ‘তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি আমার কাছে খুব প্রিয় ব্যক্তি, যার চরিত্র ভালো’।[১০]

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا ‘তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি আমার কাছে খুব প্রিয়, যার চরিত্র ভালো’।[১১]

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ خِيَارُكُمْ أَطْوَلُكُمْ أَعْمَاراً وَأَحْسَنُكُمْ أَخْلاَقاً ‘আমি কি বলে দেব না যে, তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি কে? ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, জি হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, ‘তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম, যার বয়স বেশি এবং যার চরিত্র ভালো’।[১২]

১৫. যার কাছ থেকে ভালো কাজের আশা করা যায় : এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَفَ عَلَى أُنَاسٍ جُلُوسٍ فَقَالَ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ قَالَ فَسَكَتُوا فَقَالَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ رَجُلٌ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنَا بِخَيْرِنَا مِنْ شَرِّنَا قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ وَشَرُّكُمْ مَنْ لاَ يُرْجَى خَيْرُهُ وَلاَ يُؤْمَنُ شَرُّهُ.

---

৩. ছহীহ বুখারী, হা/৫০২৭; তিরমিযী, হা/২৯০৭; আবূ দাঊদ, হা/১৪৫২; ইবনু মাজাহ, হা/২১১।
৪. ছহীহ মুসলিম, হা/৪০; মিশকাত, হা/৬।
৫. তিরমিযী, হা/১১৬২, হাদীছ হাসান ছহীহ; মিশকাত, হা/৩২৬৪।
৬. ইবনু মাজাহ, ১৯৭৭, হাদীছ ছহীহ; তিরমিযী, হা/৩৮৯৫; মিশকাত, হা/৩২৫২।
৭. তিরমিযী, হা/১৯৪৪, হাদীছ ছহীহ; মিশকাত, হা/৪৯২৭।
৮. ছহীহ বুখারী, হা/২৩০৫; ছহীহ মুসলিম, হা/১৬০১; তিরমিযী, হা/১৩১৬; নাসাঈ, হা/৪৬১৮; ইবনু মাজাহ, হা/২৪২৩।
৯. আবূ দাঊদ, হা/৫১৯৭, হাদীছ ছহীহ; মিশকাত, হা/৪৬৪৬।
১০. ছহীহ বুখারী, হা/৩৭৫৯; মিশকাত, হা/৫০৭৪।
১১. ছহীহ বুখারী, হা/৩৫৬৯; মিশকাত, হা/৫০৭৫।
১২. আহমাদ, হা/৯২২৪; মিশকাত, হা/৫১০০।

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপবিষ্ট কতিপয় ছাহাবীর নিকট এসে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি কি তোমাদের অবহিত করব না, তোমাদের মধ্যে কে ভালো লোক এবং কে খারাপ লোক? রাবী বলেন, এটা শুনে ছাহাবায়ে কেরাম চুপ রইলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ কথাটি তিন বার বললেন। তখন এক ব্যক্তি বললেন, জি হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের ভালো লোকেদেরকে খারাপ লোক থেকে পৃথক করে দেখিয়ে দিন। তিনি বললেন, 'তোমাদের মধ্যে ভালো সে ব্যক্তি, যার ভালো কাজের আশা করা যায় এবং যার মন্দ থেকে নিরাপত্তা আশা করা যায়। আর তোমাদের মধ্যে খারাপ সে ব্যক্তি, যার ভালো কাজের আশা করা যায় না, তার অনিষ্টতা থেকে নিরাপত্তার আশা করা যায় না'।[১৩]

১৬. যে ব্যক্তি বয়সে বেশি এবং কর্মে ভালো : যে ব্যক্তির বয়স বেশি এবং পাশাপাশি সৎকর্মে অগ্রগামী এমন ব্যক্তিকে সর্বোত্তম বলে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুসংবাদ দিয়েছেন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ فَقَالَ طُوبَى لِمَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْ تُفَارِقَ الدُّنْيَا وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللهِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু বুসর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, একবার এক বেদুঈন নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন, সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? তিনি (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, সৌভাগ্যবান সে ব্যক্তি, যে দীর্ঘ হায়াত পেয়েছে এবং যার আমল নেক হয়েছে। সে ব্যক্তি আবার জিজ্ঞেস করলেস, হে আল্লাহর রাসূল! কোন আমল সর্বোত্তম? তিনি (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি যখন দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবে, তখন তোমার মুখ আল্লাহর যিকিররত থাকবে।[১৪]

১৭. যাদের দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয় : আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বান্দা সেই, যাকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়। উবাদা ইবনু ছামেত (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, إِنَّ خِيَارَ أُمَّتِي الَّذِينَ إِذَا رُءُوا ذُكِرَ اللهُ وَإِنَّ شِرَارَ أُمَّتِي الْمَشَّاءُونَ بِالنَّمِيمَةِ الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الأَحِبَّةِ الْبَاغُونَ الْبُرَآءَ الْعَنَتَ 'আমার উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তারা, যাদের দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়। আর আমার উম্মতের সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি হলো তারা, যারা চোগলখোরি করে বেড়ায়, বন্ধুদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা ঘটায় এবং নির্দোষ লোকদের মাঝে দোষ খুঁজে বেড়ায়'।[১৫]

১৮. যার অন্তর পরিচ্ছন্ন এবং যে সত্যবাদী : যার অন্তর পরিচ্ছন্ন এবং যে মুখে সত্যবাদী, এমন ব্যক্তিই সবচেয়ে ভালো মানুষ। হাদীছে এসেছে,

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ قَالَ كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ وَصَدُوقِ اللِّسَانِ قَالُوا صَدُوقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ قَالَ هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ لاَ إِثْمَ فِيهِ وَلاَ بَغْيَ وَلاَ غِلَّ وَلاَ حَسَدَ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলা হলো, কোন ব্যক্তি সর্বোত্তম? তিনি বলেন, প্রত্যেক বিশুদ্ধ অন্তরের অধিকারী ও সত্যভাষী ব্যক্তি। তারা বলেন, সত্যভাষীকে তো আমরা চিনি, কিন্তু বিশুদ্ধ অন্তরের ব্যক্তি কে? তিনি বলেন, সে হলো পূত-পবিত্র নিষ্কলুষ চরিত্রের মানুষ, যার কোনো গুনাহ নাই, নাই কোনো দুশমনি, হিংসা-বিদ্বেষ, আত্মোহমিকা ও কপটতা'।[১৬] এখানে গুনাহ নেই দ্বারা উদ্দেশ্য, গুনাহ করে ফেললে তওবা করে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ 'গুনাহ থেকে তওবাকারী নিষ্পাপ ব্যক্তিতুল্য'।[১৭]

আল্লাহ তাআলা আমাদের উক্ত গুণগুলো অর্জন করার তাওফীক্ব দান করুন এবং এর মাধ্যমে আমাদের তার প্রিয় বান্দাদের কাতারে শামিল করুন- আমীন!

---

১৩. তিরমিযী, হা/২২৬৩, হাদীছ ছহীহ; মিশকাত, হা/৪৯৯৩।

১৪. তিরমিযী, হা/২৩২৯, হাদীছ ছহীহ; মিশকাত, হা/২২৭০।

১৫. আহমাদ, হা/১৭৯৯৩; সিলসিলা ছহীহা, হা/২৮৪৯।

১৬. ইবনু মাজাহ, হা/৪২১৬, হাদীছ ছহীহ; সিলসিলা ছহীহা, হা/৯৪৮; ছহীহুল জামে', হা/৩২৯১।

১৭. ইবনু মাজাহ, হা/৪২৫০; মিশকাত, হা/২৩৬৩।

হিজাবী মুসকান এবং ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি

-জুয়েল রানা*

মূল কথা : হিন্দুত্ববাদীদের আরোপিত বিতর্কিত বিষয়গুলো ভারতের মুসলিমদের জন্য ঈমান-আক্বীদা ও অস্তিত্বের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি শুধু মুসলিমদেরই সংকটে ফেলছে না; ভারতের সংবিধান এবং হিন্দু-মুসলিম উদারতার হাজার বছরের ঐতিহ্যকে কলুষিত করে আদতে ভারতকেই দুর্বল ও অস্থিতিশীল করে তুলছে। কর্ণাটকে গেরুয়াধারীদের হিজাববিরোধী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে একা রুখে দাঁড়ানো শিক্ষার্থী এখন সারা বিশ্বে প্রতিবাদের রোল মডেল হয়ে উঠেছে। নেটদুনিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিও'র ধারাবাহিকতায় সে এখন 'পোস্টার গার্ল' বলে আখ্যায়িত হচ্ছে। 'আল্লাহু আকবার' তাকবীর ধ্বনি এখন বিশ্বের সর্বোচ্চ ভাইরাল হ্যাশট্যাগ।

হিজাব কাণ্ডে উত্তাল ভারত : ভারতের কর্ণাটকের মান্দিয়ার প্রি-ইউনিভার্সিটি কলেজে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের সঙ্গে বি.কম দ্বিতীয় বর্ষের বিপ্লবী ও হিজাবী ছাত্রী মুসকান খানের (১৯) একা মুখোমুখি হওয়ার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে ইতোমধ্যেই রীতিমতো আলোচনার ঝড় তুলেছে। ভাইরাল হওয়া ভিডিওটিতে দেখা গেছে যে, সে হিজাব পরে তার স্কুটি পার্ক করে ক্লাসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বেশ কিছু মানুষ তাকে অনুসরণ করছে। দেখা যায়, গেরুয়া রঙের স্কার্ফ পরিহিত একদল ব্যক্তি 'জয় শ্রীরাম' শ্লোগানে ছাত্রীটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আর চিৎকার করছে। ওই ছাত্রীও তখন ভিড়ের দিকে ফিরে দু'হাত তুলে **'আল্লাহু আকবার'** বলে চিৎকার করছে। কিছুক্ষণের মধ্যে কলেজের কর্মকর্তারা এগিয়ে এসে তাকে ভেতরে নিয়ে যান। ওই ঘটনা আর সুপার ভাইরাল ভিডিওটি দেশ-বিদেশে আলোচনার ঝড় তুলেছে।

কর্ণাটকের উদুপি জেলায় প্রশাসনের তরফে সম্প্রতি হিজাব পরে ছাত্রীদের ক্লাসে যাওয়া নিয়ে কিছু বিধিনিষেধ জারি হয়। নির্দেশিকায় বলা হয়, 'হিজাব পরে ছাত্রীরা কলেজ ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে পারবেন না'। কর্ণাটকের শিক্ষামন্ত্রী বিসি নাগেশ কর্তৃক কার্যকর করার পরই ছাত্রীদের হিজাব পরে ঢুকতে দেওয়া হয় না। ভারতের কর্ণাটকের উদুপি জেলার কুনদাপুর ভান্ডরকরস আর্টস অ্যান্ড সায়েন্স ডিগ্রি কলেজের গেটে হিজাব পরে ছাত্রীরা ক্লাসে অংশ নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করলেও তাদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি, **ছাত্রীরা অভিযোগ করে, ক্যাম্পাসে প্রবেশের সময় কলেজের নিরাপত্তারক্ষীরা তাদের হিজাব পরে ঢুকতে বাধা দিয়েছে**। এর আগে জানুয়ারিতে ভারতেরই উদুপির সরকারি পিউ গার্লস কলেজে প্রথম হিজাব পরে ছয় মুসলিম ছাত্রীকে ক্লাস করতে বাধা দেওয়া হয়। তারপর নতুন করে কুনদাপুর সরকারি জুনিয়র কলেজে মুসলিম ছাত্রীকে হিজাব পরে ক্যাম্পাসে প্রবেশে বাধা দেওয়া হয়। এর সঙ্গে ভারতের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে হিজাব ইস্যুতে বিতর্ক ক্রমেই বাড়ছে।

স্কুল-কলেজে হিজাব পরে আসা যাবে না, এ দাবিতে কয়েক দিন ধরে পথে নেমেছে কর্ণাটকের কট্টর হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো। শান্তিপূর্ণ অবস্থান থেকে তা ক্রমশ হিংসাত্মক আকার নিচ্ছে। তেমনই ঘটনা ঘটেছে উক্ত প্রি-ইউনিভার্সিটি কলেজেও।

কর্ণাটকের প্রি-ইউনিভার্সিটি কলেজে একদল উগ্র হিন্দুত্ববাদী তরুণের সামনে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি তোলা সাহসী শিক্ষার্থী বিবি মুসকান খানের প্রশংসায় যখন পঞ্চমুখ সারা বিশ্ব, তখন উল্টো তার বিরুদ্ধেই কথিত উসকানি দেওয়ার অভিযোগ তুললেন রাজ্যটির শিক্ষামন্ত্রী বি সি নাগেশ। শিক্ষামন্ত্রীর অভিযোগ, মুসকানই 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দেওয়া তরুণদের উসকে দিয়েছে (?)।

মুসকান খানের বর্ণনা ও প্রতিক্রিয়া : সেদিনের ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে মুসকান বলে, 'আমাকে দেখেই 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দেওয়া শুরু হয়। আমিও পাল্টা 'আল্লাহু আকবার' স্লোগান দিতে থাকি। আমি আল্লাহু আকবার

* খত্বীব, গছাহার বেগ পাড়া জামে মসজিদ (১২ নং আলোকডিহি ইউনিয়ন), গছাহার, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

বলেছিলাম, কারণ আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম এবং যখন আমি ভয় পাই, তখন আমি আল্লাহর নাম নিই'।

তার দাবি, উপস্থিত গেরুয়া পরিহিতদের কয়েকজনকে চিনতে পেরেছে সে। কারণ তারাও মুসকানের সহপাঠী। তবে বেশির ভাগই বহিরাগত। মুসকান আরও বলে যে, পড়াশোনা করা আমাদের অধিকার। এক টুকরো কাপড়ের জন্য (হিজাব) ওরা আমাদের পড়াশোনা করার অধিকারটাই ছিনিয়ে নিতে চায়।

বিবি মুসকান খান একা ছিলেন না। কলেজের বাইরে আরও পাঁচ-ছয় জন মেয়ে ছিল, যারা কলেজে ঢুকতে না পারায় কাঁদছিল। তারাও মুসকানকে বলেছিল, 'তুমি তোমার হিজাব খুলে নাও, ওরা তোমাকে ঢুকতে দেবে না' কিন্তু মুসকান তা প্রত্যাখ্যান করে এবং বীরদর্পে এগিয়ে যায়। শিরকী স্লোগান এর বিপরীতে তাওহীদের এই হুংকারে বিশ্ব আজ থরথর করে কাঁপছে। আল্লাহু আকবার তাকবীর এই ধ্বনি মুসলিমের ঘুমন্ত ঈমানী চেতনাকে জাগিয়ে তুলেছে। আল্লাহু আকবার ধ্বনি এটম বোম এর চাইতেও ভারী। বহু পাওয়ারফুল রাষ্ট্র পরাশক্তি এই তাকবীরের কাছে ধ্বংস হয়ে গেছে। এই মহাসত্য আজ ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত। **মুসলিম কখনো সংখ্যার উপর ভর করে লড়াই করে না। মুসলিম ঈমানের বলে বলিয়ান হয়ে আল্লাহদ্রোহী কাফের-মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করে।**

হিজাব বিতর্কে উল্টো সুর : বিবি মুসকান খান (Bibi Muskan Khan) নামের ওই তরুণীর সাহসিকতার জন্য জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ (Jamiat Ulama-i-Hind) যখন ৫ (পাঁচ) লক্ষ রুপি পুরস্কার ঘোষণা ও হস্তান্তর করেছে, ঠিক তখনই প্রতিবাদী মুসকানকে সমর্থন করে তার পাশে দাঁড়িয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (RSS) মুসলিম শাখা।

যেভাবে মুসকানকে ঘিরে ধরে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দিয়েছিল হিন্দুত্ববাদী ছাত্ররা, এদিন তার নিন্দা করা হয় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের মুসলিম শাখার তরফে। 'মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চে'র (Muslim Rashtriya Manch) অবধ প্রান্ত সঞ্চালক অনিল সিং বলেন, 'ও আমাদের কন্যা ও বোন। খারাপ সময়ে আমরা ওর সঙ্গে আছি'।

মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চের তরফে এদিন মন্তব্য করা হয়, হিন্দু সংস্কৃতি মেয়েদের শ্রদ্ধা করতে শেখায়, যারা সেদিন জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিয়ে মেয়েটিকে আতঙ্কিত করেছিল, তারা ঠিক কাজ করেনি। আরএসএস-এর মুসলিম মঞ্চ নিজেদের বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'মেয়েটির হিজাব পরার সাংবিধানিক স্বাধীনতা রয়েছে'।

আরএসএসের মুসলিম শাখার তরফে আরও বলা হয়, **'গেরুয়া উত্তরীয় পরা ছেলেদের আচরণ গ্রহণযোগ্য নয়। তারা হিন্দু সংস্কৃতির মর্যাদাহানী করেছে'।** মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চের অবধ প্রান্ত সঞ্চালক অনিল সিং বলেন, 'হিজাব ও পর্দা ভারতীয় সংস্কৃতির অংশ। হিন্দু মহিলারাও পর্দার ব্যবহার করে। বিবি মুসকানও তা ব্যবহার করতে পারে'। একই সঙ্গে অনিল সিং সঙ্ঘ পরিচালক মোহন ভাগবতের উক্তি ধার করে বলেন, 'মুসলিমরা আমাদের ভাই। আমাদের শরীরে একই ডিএনএ রয়েছে। আমি হিন্দুদের বলব, মুসলিমদের ভাই হিসাবে গ্রহণ করুন'। যদিও সম্প্রতি হায়দরাবাদে সন্ত রামানুজের জন্মবার্ষিক অনুষ্ঠানে আরএসএস প্রধান বলেছিলেন, হিন্দুদের ভালো মানেই রাষ্ট্রের ভালো (?)।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির খবরে বলা হয়েছে, কর্ণাটকের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষামন্ত্রী বি সি নাগেশ গেরুয়া উত্তরীয় পরা তরুণদের পক্ষ নিয়ে বলেছেন, 'মেয়েটিকে ঘেরাও করার ইচ্ছা ছিল না তাদের (তরুণদের)। কিন্তু সে (মুসকান) যখন চিৎকার শুরু করল... সে যখন 'আল্লাহু আকবার' বলে চিৎকার করছিল, তখন তার পাশে একজন শিক্ষার্থীও ছিল না। সে (মুসকান) কেন কলেজ ক্যাম্পাসে আল্লাহু আকবার বলে উসকানি দিল?

শান্তিতে নোবেলজয়ী মালালা ইউসুফজাই গেরুয়াধারীদের হিজাব বিদ্বেষের প্রতিবাদ এবং মুসকানের সাহসী ভূমিকার প্রশংসা করেছেন। হিজাব বিরোধিতার নামে মুসলিমদের শিক্ষায় প্রান্তিককরণের অভিযোগ তুলেছেন মালালা। একইভাবে ভারতের কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধীও মুসকানের সমর্থনে বিবৃতি দিয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক দূত রশীদ হুসাইন এক টুইট বার্তায় ভারতের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় স্বাধীনতা লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলেছেন। তিনি এক টুইট

বার্তায় বলেছেন, ধর্মীয় স্বাধীনতার মধ্যে একজনের ধর্মীয় পোশাক বেছে নেওয়ার ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত। তাই কর্ণাটকে ধর্মীয় পোশাকের অনুমতি নির্ধারণ করা উচিত নয়। এ ছাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হিজাব নিষিদ্ধ করা ধর্মীয় স্বাধীনতা লঙ্ঘন করে এবং নারী ও মেয়েদের কলঙ্কিত করে'।

ভারতের কর্ণাটকের কলেজছাত্রী মুসকান হিন্দু জঙ্গীদের ভয় না পেয়ে মুখের উপর আল্লাহু আকবার বলে প্রতিবাদ করেছে। এটা আমাদের বহু মানুষকে আনন্দিত করেছে, অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। মুসকানকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে তার শিক্ষকরা, এরপর তার পক্ষে সরব হয়েছে মানবাধিকার কর্মী, গণমাধ্যম ও সাধারণ মানুষরা। এদের অনেকেই হিন্দু ধর্মের মানুষ, কিন্তু মুসকানের ঘটনাটি তারা ধর্মের ভিত্তিতে না দেখে, মানবিকতা ও মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছে। আমরাও মুসকানের ওই সাহসিকতাকে বাহবা জানাচ্ছি।

জাতিসংঘ ও সেক্যুলারদের নীরবতা : ইসলামবিদ্বেষ ও মুসলিমবিরোধী নানা অপতৎপরতা ভারতের ক্ষমতাসীন বিজেপির হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির মূল বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এটি নতুন বা হঠাৎ করে জেগে ওঠা কোনো বিষয় নয়। দিল্লিতে ক্ষমতায় বসার আগে থেকেই বিজেপি অধ্যুষিত বিভিন্ন রাজ্যে মুসলিমবিদ্বেষী দাঙ্গায় শত শত মানুষের প্রাণহানি যে অশনিসংকেত দিয়েছিল, নরেন্দ্র মোদির দিল্লিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তারই ধারাবাহিকতা চলছে।

কখনো গো-রক্ষার নামে, কখনো এনআরসি আবার কখনো হিজাব পরার বিরুদ্ধে বিজেপির উগ্র গেরুয়া সন্ত্রাসীদের সন্ত্রাস চলছেই। বিজেপি শাসিত কর্ণাটকে স্কুল-কলেজের মুসলিম শিক্ষার্থীদের হিজাব পরার বিরুদ্ধে খোদ রাজ্য সরকারের বিতর্কিত ভূমিকায় সেখানকার মুসলিমরা বিক্ষুব্ধ ও হতাশ হলেও রাজনীতি বা সামাজিক ময়দানে তার তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া ছিল না।

৯০% মুসলিম এর দেশ আমাদের বাংলাদেশেও কিছু কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হিজাব ও বোরকা নিষিদ্ধ করার দুঃসাহস দেখানো হচ্ছে, যা মোটেই কাম্য ও ফলপ্রসূ নয়।

বিবি মুসকানের মহানুভবতা : মুসকান পরে তার প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে তাকে উত্ত্যক্তকারীদের কোনো শাস্তি দাবি করেনি। শুধু তাদের এগুলো আর না করার আহ্বান জানিয়েছে। এই মহানুভবতা তাকে উত্ত্যক্তকারীদের চেয়ে অনেক উপরে আসন দিয়েছে। হিজাব পরা সংক্রান্ত তার বক্তব্য আর অবস্থানকে মানুষ অনেক বেশি সহনশীলভাবে দেখছে। আমাদের নিজেদেরও অনেক কিছু শেখার আছে তরুণ বয়সী এই মেয়েটির মানবিকতা থেকে।

শেষ কথা : ভারতের কর্ণাটকের উচ্চ আদালত থেকে হিজাবের পক্ষে রায় আসবে আশা করি।

অসত্যের কাছে কভু নত নয় মম শির,
ভয়ে কাঁপে কাপুরুষ, লড়ে যায় বীর।

'শবেবরাত পালন করা বিদআত' প্রবন্ধটির বাকী অংশ

নবী কারীম ﷺ তাঁর নবুঅতের ২৩ বছরের জীবনে কখনো তার ছাহাবীগণকে সাথে নিয়ে মক্কায় মসজিদুল হারামে অথবা মদীনায় মসজিদে নববীতে কিংবা অন্য কোনো মসজিদে একত্র হয়ে উল্লিখিত ইবাদত-বন্দেগীসমূহ করেছেন এমন কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। তাঁর ইন্তেকালের পরে তাঁর ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লা-হু আনহুম তথা খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে কেউ জানত না- শবেবরাত কী এবং এতে কী করতে হয়। তারা নবী ﷺ-এর আমল প্রত্যক্ষ করেছেন। আমাদের চেয়ে উত্তমরূপে কুরআন অধ্যয়ন করেছেন। তারা তাতে শবেবরাত সম্পর্কে কোনো দিক-নির্দেশনা পেলেন না। তারা তাদের জীবন কাটালেন আল্লাহর নবী ﷺ-এর সঙ্গে, অথচ জীবনের একটি বারও তাঁর কাছ থেকে শবেবরাত বা মুক্তির রজনির সবক পেলেন না? যা পালন করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলে যাননি, যা কুরআনে নেই, রাসূল ﷺ-এর তা'লীমে নেই, ছাহাবীগণের আমলে নেই, তাদের সোনালী যুগের বহু বছর পরে প্রচলন করা শবেবরাতকে আমরা বিদআত বলতে চাই। আমরা বলতে চাই, এটা একটা মনগড়া ইবাদত পর্ব। আমরা মানুষকে বুঝাতে চাই, এসব প্রচলিত ও বানোয়াট মুক্তির রজনি উদযাপন থেকে দূরে থাকতে হবে, উম্মতকে কুরআন-সুন্নাহমুখী করতে এবং সেই অনুযায়ী আমল করাতে অভ্যস্ত করতে চাই। মহান আল্লাহ মুসলিম উম্মাহর সকলকে বিশেষ করে বাংলাদেশসহ এ উপমহাদেশের মুসলিমদেরকে সকল প্রকার ধর্মীয় বিদআত থেকে আর ভণ্ড পীর-বুযুর্গ নামধারী ইসলামের শত্রুদের হাত

বন্ধু আমার! পাপ করো না, পাপ হয়ে গেলে তওবা করতে ভুলো না

-জাবির হোসেন*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মহানবী ﷺ বলেছেন, ‘কোনো বান্দা অপরাধ করল এবং বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি অপরাধ করেছি, তুমি তা ক্ষমা করো। তখন আল্লাহ বলেন, (হে আমার ফেরেশতাগণ!) আমার বান্দা কি জানে যে তার একজন প্রতিপালক আছেন, যিনি অপরাধ ক্ষমা করেন অথবা অপরাধের কারণে শাস্তি দিবেন? (তোমরা সাক্ষী থাকো) আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর আল্লাহ যতদিন চাইলেন ততদিন অপরাধ না করে থাকল। আবার অপরাধ করল এবং বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি আবার অপরাধ করেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা কি জানে যে তার একজন প্রতিপালক আছেন, যিনি অপরাধ ক্ষমা করেন অথবা অপরাধের কারণে শাস্তি দেবেন? আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর সে অপরাধ না করে থাকল যতদিন আল্লাহ চাইলেন। আবার অপরাধ করল এবং বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি আবার আর এক অপরাধ করেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা কি জানে যে তার একজন প্রতিপালক আছেন, যিনি অপরাধ ক্ষমা করেন অথবা অপরাধের কারণে শাস্তি দেন? আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। সে যা ইচ্ছা করুক।[১]

এই হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল অপরাধ যতবারই হোক নিরাশ হওয়ার কিছু নেই। আল্লাহ ক্ষমা করেন এ বিশ্বাস রেখে একাধিকবার অপরাধ করেও ক্ষমা চাইলে ক্ষমা হবে। হাদীছের অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ গুনাহ করার আদেশ করলেন; বরং আল্লাহর দয়া ও ক্ষমার মাহাত্ম্য দেখানো হয়েছে।[২]

উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী বলেন, বান্দা যদি একশবার বা হাজারবার বা তার চেয়ে বেশিবারও পাপ করে আর প্রত্যেকবার তওবা করে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। এমনকি সকল পাপের জন্য একবার তওবা করলেও তার তওবা শুদ্ধ হবে।[৩] অতএব, নিরাশ না হয়ে পুনরায় পাপ না করার দৃঢ় ইচ্ছার সাথে তওবা করতে হবে। সাথে সাথে ভালো মানুষদের সাথে উঠা-বসা করতে হবে। আল্লাহ বলেন, ‘আর তুমি নিজেকে ধরে রাখো তাদের সাথে যারা সকালে ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে ডাকে তাঁর দীদার লাভের কামনায় এবং তুমি তাদের থেকে তোমার দু’চোখ ফিরিয়ে নিয়ো না পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনায়’ *(আল-কাহফ, ১৮/২৮)*।[৪]

বন্ধু আমার! একটি হাদীছ শোনো।

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর শপথ! আমি প্রতিদিন আল্লাহর কাছে সত্তরবারেরও অধিক ইসতিগফার ও তওবা করে থাকি’।[৫]

বন্ধু! লক্ষ্য করো— উক্ত হাদীছটিতে প্রিয় নবী ﷺ বলেছেন, তিনি নিজে দৈনিক সত্তরবার তওবা করে থাকেন। এখন প্রশ্ন হলো, নবী ﷺ ছিলেন মাসূম অর্থাৎ পাপ থেকে মুক্ত, তারপরও তিনি কেন তওবা করেছেন? কারণ, (১) তিনি উম্মতকে ইসতিগফার ও তওবার গুরুত্ব অনুধাবন করানোর জন্য নিজে তা আমল করেছেন। (২) পাপ না থাকলেও তওবা ও ইসতিগফার করা যায়। এটা বুঝাতে তিনি এ আমল করেছেন। আর তখন তওবা ও ইসতিগফারের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার কাছে মর্যাদা বৃদ্ধি হয়। (৩) ইসতিগফার ও তওবা হলো ইবাদত। পাপ না করলে তা করা যাবে না এমন কোনো নিয়ম নেই। কেউ যদি তার নযরে কোনো পাপ নাও দেখে, তবুও সে যেন ইসতিগফার ও তওবা করতে থাকে। হতে পারে অজান্তে কোনো পাপ তার দ্বারা সংঘটিত হয়ে গেছে বা কোনো পাপ করে সে ভুলে গেছে। (৪) সত্তর সংখ্যাটি আধিক্য বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। নির্দিষ্ট সংখ্যা বুঝাতে নয়। (৫) ইসতিগফার ও তওবা আমলটি সর্বদা অব্যাহত রাখা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত।[৬]

বন্ধু আমার! পাপ করো না, কিন্তু পাপ হয়ে গেলে তওবা করো। তোমাকে জানিয়ে রাখি, তওবাকারীর মর্যাদা কী? মহান আল্লাহ বলেছেন, ‘আর যারা অশ্লীল কাজ করলে অথবা নিজেদের প্রতি যুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে,

---

* এম. এ. (অধ্যয়নরত), বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

১. ছহীহ বুখারী, হা/৭৫০৭।

২. আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ, কে বড় লাভবান (নিবরাস প্রকাশনী, তৃতীয় সংস্করণ), পৃ. ২৬-২৭।

৩. নববী, শারহে মুসলিম, ২/২৭৫৭, ১৭/৭৫; ফাতহুল বারী, ১৩/৪৭২।

৪. মাসিক আত-তাহরীক (ডিসেম্বর-২০১৯), পৃ. ৫০।

৫. ছহীহ বুখারী, হা/৬৩০৭।

৬. আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান, তাওবা : কেন ও কিভাবে (Islamhouse.com), ‘হাদীছ-১৩’-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

অতঃপর তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ ছাড়া কে গুনাহ ক্ষমা করবে? আর তারা যা করেছে, জেনেশুনে তা তারা বারবার করে না বা এর উপরে তারা অটল থাকে না। এরাই তারা, যাদের প্রতিদান তাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং জান্নাতসমূহ যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। যেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর আমলকারীদের প্রতিদান কতই না উত্তম' *(আলে ইমরান, ৩/১৩৫-১৩৬)*। হাদীছে কুদসীতে মহান আল্লাহ বলেছেন, 'হে আমার বান্দারা! তোমরা রাতদিন পাপ করে থাক। আর আমি সমস্ত পাপ ক্ষমা করে থাকি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিব'।[৭]

মহান আল্লাহ বলেন, 'তবে যারা তওবা করে, বিশ্বাস ও সৎকাজ করে, আল্লাহ তাদের পাপকর্মগুলোকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আর আল্লাহ অসীম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(আল-ফুরকান, ২৫/৭০)*। হাদীছে এসেছে, আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা বান্দার তওবার কারণে সেই লোকটির চেয়েও অধিক খুশী হন, যে লোকটি মরুভূমিতে তাঁর উট হারিয়ে পরে তা পেয়ে যায়'।[৮]

বন্ধু আমার! যারা তোমরা উদাসীন হয়ে আল্লাহর বিধানকে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছ। আধুনিকতার দোহাই পেড়ে মদ-জুয়া, গান-বাজনা, ও হারাম কাজে সময় অতিবাহিত করছ। প্রগতির স্রোতে ভাসমান হয়ে অবৈধ প্রেম আর ভালোবাসার নামে ব্যভিচারে লিপ্ত হচ্ছ। শিরক ও বিদআতসহ আরও হাজারো পাপে জড়িত হচ্ছ— তোমরা কি দেখতে পাও না, তোমাদের চোখের সামনে অসংখ্য দুর্ঘটনায় কত মানুষ মারা যাচ্ছে? তা থেকে তুমি কি শিক্ষা গ্রহণ করতে চাও না? মানুষের মৃত্যু তোমাদের অন্তরে কি রেখাপাত করে না? তুমি কি ভেবেছ, চিরদিন এই ধরাতে থাকবে? মৃত্যু কি তোমাকে গ্রাস করবে না? তোমার মৃত্যু দেখে তোমারই অন্য কোনো বন্ধু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। মহান আল্লাহর কাছে তওবা করে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে পারে। কিন্তু তুমি? তুমি তো এখন মৃত। তুমি এখন শুধুই লাশ। মৃত্যুর পর তওবার দরজা একেবারেই বন্ধ; ফলে তওবা করার কোনো সুযোগ তোমার এখন আর নেই। কিন্তু বেঁচে থাকা তোমার একই টেবিলের বন্ধুর রয়েছে। কারণ, সে বেঁচে আছে। তোমার পরকাল ধ্বংস সুনিশ্চিত। তবে কী তুমি অন্যদের দেখে শিক্ষা গ্রহণ করবে না?

তবে কেন দেরি করছ? তোমার প্রতিপালক জানান দিচ্ছেন, 'বলো, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(আয-যুমার,৩৯/৫৩)*।

তবে তিনি শর্ত প্রদান করেছেন পরের আয়াতে, 'আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হও এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পন করো, তোমাদের নিকট শাস্তি আসার পূর্বে, তৎপর তোমাদের সাহায্য করা হবে না' *(আয-যুমার, ৩৯/৫৪)*।

বন্ধু আমার! তওবার সময় ফুরিয়ে যাওয়ার পূর্বেই আমাদের তওবা করা আবশ্যক। কারণ, তওবার জন্য নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হবার পরে আল্লাহ তাআলা আর তওবা কবুল করবেন না। নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'আল্লাহ বান্দার তওবা কবুল করেন যতক্ষণ না কণ্ঠনালীর নিকট দম আসে, কিন্তু কণ্ঠনালীর নিকট দম এসে গেলে তখন আর তওবা কবুল করা হয় না'।[৯] আল্লাহ বলেন, 'ঐ সব লোকের জন্য তওবা নেই, যারা পাপ করতে থাকে, এমনকি যখন মৃত্যু এসে যায় তখন বলতে থাকে, এখন তওবা করছি' *(আন-নিসা, ৪/১৮)*। প্রখ্যাত ছাহাবী আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'পশ্চিমদিক হতে সূর্যোদয়ের পূর্বে (কিয়ামতের পূর্বে) যে তওবা করে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন'।[১০]

সুতরাং, আমরা কি জানি কখন মৃত্যুদূত আমাদের দুয়ারে এসে উপস্থিত হয়? এখন এমনও তো হতে পারে যে, আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারব না— এমনকি এই লেখাটিও পড়ে শেষ করার পূর্বেই তোমার ও আমার দেহ হতে প্রাণপাখি উড়ে যাবে। অতএব, এসো আমরা দ্রুত তওবা করি। তওবার পথ এখনো খোলা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন।[১১]

পরিশেষে, তোমাকে আবারও স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিদায় নিই— বন্ধু আমার! পাপ করো না, কিন্তু পাপ হয়ে গেলে সত্বর তওবা করো। তাতে পরকালে তোমার সফলতা সুনিশ্চিত।

---

৭. ছহীহ মুসলিম, হা/৬৭৩।

৮. ছহীহ বুখারী, হা/৬৩০৯।

৯. তিরমিযী, হা/৩৫৩৭, হাদীছ হাসান।

১০. ছহীহ মুসলিম, হা/৭০৩৬।

১১. আব্দুল্লাহিল হাদী, একশত কাবীরা গুনাহ (মাকতাবাতুস সুন্নাহ), পৃ. ১৬।

নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলাম

-হাফেয আব্দুর রহমান বিন জামিল*

সভ্যতার চরম বিকাশের যুগেও নারীর যে অমর্যাদা ও অবমূল্যায়ন দেখা যাচ্ছে, তা আরবের আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগকেও ছাড়িয়ে যায়নি- একথা বলা যাবে না। শুধু এদেশেই নয়; পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই নারী জাতি এক অসহনীয় অমর্যাদাকর পরিস্থিতির শিকার। নির্যাতন, নারীপাচার, ধর্ষণ, অপহরণ, এসিড নিক্ষেপ, যৌতুকের দাবি, বিভিন্ন ধরনের পারিবারিক নির্যাতন, মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার প্রভৃতি নিত্যদিনের ঘটনা আমাদের আতঙ্কিত করে। অপ্রাপ্তবয়স্কা কিশোরী, হাসপাতালের অসুস্থ রোগী এমনকি মৃত লাশ পর্যন্ত পাশবিকতার হিংস্র থাবা থেকে রেহাই পাচ্ছে না। নারী কর্তৃক নারী নির্যাতনের ঘটনাও এ সমাজে কম ঘটে না।

বিগত যুগেও এমনভাবে বিভিন্ন অজুহাত ও কলাকৌশলে তাদেরকে নির্যাতিত হতে হয়েছে। সে যুগে সমাজিকভাবে এর প্রতিরোধের চেষ্টা একেবারে হয়নি একথা বলা যাবে না, তবে যতটুকু হয়েছিল তা সাফল্যের মুখ দেখতে পারেনি। এক্ষেত্রে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে বিগত সভ্যতা কর্তৃক নারীকে প্রদত্ত মর্যাদার সাথে ইসলামের দেওয়া মর্যাদার পার্থক্য তুলে ধরতে চেষ্টা করা হবে।

১. গ্রীক সভ্যতায় নারীর অবস্থান : প্রাচীন নানা সভ্যতার মধ্যে গ্রীক সভ্যতা ছিল নামকরা সভ্যতা। জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও চিকিৎসাশাস্ত্রে তৎকালীন পৃথিবীর নেতৃত্ব তাদের হাতে ছিল। কিন্তু নারীর মর্যাদা সেখানে ছিল খুবই দুর্ভাগ্যজনক। গ্রীকদের ধর্মীয় গ্রন্থসমূহে 'নারীকে' মানুষের দুঃখ-কষ্টের মূল উৎস হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই নোংরা আক্বীদা তাদের নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। ফলে কিছুসংখ্যক ব্যতীত অধিকাংশ গ্রীকদের নিকটে নারীর মর্যাদা ছিল না বললেই চলে। অধিকাংশের নিকট বিয়ে ছিল বোঝাস্বরূপ। নারীদের প্রতি সমাজের দায়িত্ববোধ ছিল না বললেই চলে। তৎকালীন সমাজে নারীর অবস্থা পতিতালয়ের নারীদের চাইতেও করুণ ছিল। অবক্ষয়ের যুগে গ্রীকরা আফ্রোদিত (APHRODITE) নামক প্রেম দেবীর পূজা শুরু করে। ফলে বেশ্যালয়গুলো উপাসনালয়ের ন্যায় উঁচু-নিচু সকল স্তরের নারীর কেন্দ্রে পরিণত হয়। এভাবে নারী সমাজের অবমাননার মধ্য দিয়ে গ্রীক সভ্যতার মৃত্যুঘণ্টা বেজে উঠে।

২. রোমক সভ্যতায় নারী : গ্রীকদের পরেই ইতিহাসে রোমান সভ্যতার স্থান। তাদের উন্নতির যুগে নারীর সতীত্ব ও সম্মানকে খুবই মর্যাদার চোখে দেখা হতো। সে সমাজে বৈবাহিক বন্ধন ও পর্দাপ্রথা চালু ছিল। বেশ্যাবৃত্তি চালু থাকলেও লোকেরা এটাকে খুবই ঘৃণা করত।

কিন্তু বৈষয়িক জীবনে তাদের উন্নয়ন চরম শিখরে উপনীত হলে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে যায়। স্বাধীনতার নামে ঘরের নিরাপদ আশ্রয়স্থল থেকে নারীদের বের করে বাহিরে নিয়ে আসে। সমঅধিকারের ধুয়া তুলে পুরুষের পাশাপাশি তাদেরকে কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়। ফলে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার প্রতি মানুষের আগ্রহ কমে যায়। পারিবারিক জীবনে দাম্পত্যের বন্ধন শিথিল হতে থাকে। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে অবিশ্বাস আর সন্দেহের দানা বাধতে থাকে। বিবাহ বিচ্ছেদ আশঙ্কাজনকভাবে বাড়তে থাকে। একসময় বিবাহ সামাজিক চুক্তির ন্যায় হয়ে যায়, যা যেকোনো সময় ভঙ্গ করা যায়। নারীদের বৈবাহিক বন্ধন বাতিল করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অন্যত্রে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে সচরাচর দেখা যেত। পাদ্রী জুরুম (৩৪০-৪২০ খ্রি.) বিগত যুগের একজন নারীর কথা বলেন, যে ৩২ জন পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল এবং সে তার শেষ স্বামীর ২১তম স্ত্রী ছিল। এসব বিয়েকে সমাজপতিরা 'ভদ্র যেনা' বলে পরিচয় দিতেন। রোম সমাজের নৈতিকতা বিষয়ক উপদেষ্টা কাতো (CATO) বিষয়টি স্বীকার করেন এবং সমাজে অবাধে প্রচলিত বহুবিবাহ প্রথাকে 'মন্দ কাজ নয়' বলে মন্তব্য করেন। এভাবে অবাধ যৌনাচারের বিষাক্ত প্রভাবে রোমকদের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে যায়, যা তাদের সভ্যতার দ্রুত পতনকে ত্বরান্বিত করে।

৩. ইউরোপীয় খ্রিষ্টানদের দৃষ্টিতে নারী : রোমকদের পতনের পর খ্রিষ্ট ধর্ম ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রসার লাভ করে। রোমানদের করুণ পতন তাদের উপর দারুণ প্রভাব ফেলে। সেজন্য তারা নারীসঙ্গ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়। খ্রিষ্টান ধর্মযাজকদের ঘোষণানুযায়ী, নারী হলো সকল পাপের উৎস এবং মানবজাতির জন্য অভিশাপ। তারতুলিয়ান, ক্রিসোসতাম প্রমুখ পাদ্রী নেতা নারীর সাথে যে কোন উপায়ে যৌনাচারে লিপ্ত হওয়াকে বিধিবদ্ধ ব্যাভিচার হিসাবে নিন্দনীয় মনে করলেও বিয়েকে হালাল বলে মনে করতেন। খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতকে প্রচলিত বৈষম্যমূলক নারী বিদ্বেষী এই সামাজিক প্রথা সমগ্র খ্রিষ্টান জগতকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং নারীর প্রায় সকল অধিকার হরণ করে নেওয়া হয়। ১৮শ শতাব্দিতে ফরাসী বিপ্লব পর্যন্ত এই অবস্থা কম-বেশি চলমান থাকে। কিন্তু নারী বিদ্বেষমূলক এই চরম পন্থা বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। ১৯ শতকের সূচনালগ্নে এই অবস্থার আমূল পরিবর্তন হতে থাকে এবং নারী স্বাধীনতার নামে অশ্লীলতা ও যৌনাচারের পথকে উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। যেখানে নারী-

* অধ্যক্ষ, জামি'আহ দারুল ইহসান আল-আরাবিয়্যাহ, কালনী, গোবিন্দপুর, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

পুরুষের মেলামেশার অবারিত সুযোগ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমতা বিধান নিশ্চিত করার কথা বলা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, উভয় নীতিই ছিল চরমপন্থা নির্ভর এবং মানব স্বভাব ও প্রকৃতি বিরোধী। ফলে পূর্বের লুপ্ত সভ্যতার ন্যায় অবাধ যৌনাচারের বিষবাষ্পে খ্রিষ্টীয় সভ্যতার ধ্বংসের পথ প্রশস্ত হতে থাকে। অশ্লীলতার পথে তাদের উৎসাহী হওয়ার ক্ষেত্রে প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যম প্রধান নিয়ামকের ভূমিকা পালন করছে। তাদের সমাজে গর্ভপাতকে আইনগতভাবে সিদ্ধ করা হয়েছে। কুমারীর মাতা হওয়াকে এখন তাদের সমাজে লজ্জা বা দোষের দৃষ্টিতে দেখা হয় না। নারীদের 'কলগার্ল' বা যৌনদাসী হওয়াকে সে দেশের সভ্যতার অংশ মনে করা হয়। তাদের সাহিত্য যৌন সুড়সুড়িমূলক আলোচনায় ভরপুর। নগ্নতা এখন তাদের সাংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। বল্গাহীন নারী স্বাধীনতা প্রকারান্তরে নারীত্বের অমর্যাদার শামিল। তাই বলা চলে যে, বর্তমানের খ্রিষ্টীয় বা আধুনিক সভ্যতা রোমক ও গ্রীক সভ্যতার ন্যায় ক্রমশই ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে।

৪. কমিউনিস্ট ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে নারীর মর্যাদা : বর্তমান যুগে কমিউনিস্ট বিশ্বে যে সামাজিক ব্যবস্থা চালু হয়েছে, তা মূলত ইরানের প্রাচীন 'মাযদাকী' মতবাদেরই প্রতিচ্ছবি মাত্র। বাদশা নওশেরওয়া এর পিতা কোবাদ এর আমলে 'মাযদাক' নামক জনৈক চিন্তাবিদ মত প্রকাশ করেন যে, মানব সমাজে সকল অশান্তির মূল কারণ হলো, নারী ও অর্থ-সম্পদ। অতএব, এই দুটিকে ব্যক্তিমালিকানা থেকে বের করে জাতীয় মালিকানায় থাকতে হবে। আগুন, পানি ও মাটিতে যেমন সকলের অধিকার আছে, নারী ও সম্পদেও তেমনি সকলের সমান অধিকার থাকবে। বর্তমান সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে সম্পদ জাতীয়করণ করা হয়েছে। নারীর অবস্থা সেখানে মাযদাকী আমলের চেয়ে খুব একটা পৃথক নয়। সেখানে বিবাহ প্রথা চালু থাকলেও, ঘুনে ধরা কাঠের মতোই তা ভঙ্গুর। ফলে নারী সমাজের মর্যাদা ক্রমশই ভোগ্যপণ্যের মতো অবস্থার দিকে যাচ্ছে।

৫. ইয়াহূদী, ব্যবিলনীয়, পারস্য ও হিন্দু সভ্যতায় নারী : ইয়াহূদীদের ধারণা মতে, মা 'হাওয়া' ছিলেন 'মানবজাতির সকল দুঃখ-কষ্টের মূল'। এই ভুল ধারণাই ইয়াহূদী সমাজ জীবনের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। ফলে তাদের সমাজে নারীর মর্যাদা বলতে তেমন কিছুই ছিল না।

গ্রীক সভ্যতার চরম অবক্ষয়ের যুগে ব্যবিলনীয় ও পারসিক সভ্যতায় ব্যাপক অধঃপতন নেমে আসে। ব্যবিলনীয়দের মাঝে ব্যভিচার সাধারণ কর্মকাণ্ডের মতো সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। পারসিকদের মধ্যে 'মাযদাকি' মতবাদের প্রসার ঘটে। একই সময়ে হিন্দুদের মধ্যে 'বামমার্গী' নামক চরম নোংরা ধর্মীয় মতবাদ চালু হয়। যেখানে নারীরা পরকালীন মুক্তির মিথ্যা প্রলোভনে পড়ে বামমার্গী সাধুদের বাড়িতে ও মন্দিরে স্বেচ্ছায় এসে সাধুদের যৌনতৃপ্তি দিত। গ্রীকদের ন্যায় নারীরা হিন্দুদের নিকট 'পাপাত্মা' বলে কথিত ছিল। সেকারণে তাদেরকে সম্পত্তির অধিকার, বিধবা বিবাহের অধিকার ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত করা হয়। এমনকি বিধবা নারীকে মৃত স্বামীর চিতায় জীবন্ত পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থা করা হয়, যা 'সতীদাহ' প্রথা নামে পরিচিত। নারীদের জন্য শিক্ষা গ্রহণ ও ধর্মগ্রন্থ স্পর্শ করা নিষিদ্ধ করা হয়। গান্ধর্ব বিবাহ, রাক্ষস বিবাহ, শিবলিঙ্গ পূজা প্রভৃতির মাধ্যমে তারা নারীকে স্রেফ ভোগের পণ্য হিসেবে ব্যবহার করে, যা কম-বেশি আজও চালু আছে।

৬. প্রাক ইসলামী যুগে আরবদের নিকটে নারী : ইসলাম আসার প্রাককালে আরবীয় মহিলা সমাজে দুটি স্তর ছিল-

(ক) উচ্চ শ্রেণির নারী : কবিতা, বীরত্ব, চিকিৎসা, বক্তৃতা, প্রজ্ঞা ইত্যাদির দিক দিয়ে এরা ছিলেন সকলের নিকটে শ্রদ্ধার পাত্রী। মা খাদীজা এই স্তরেরই একজন স্বনামধন্যা বিদুষী নারী ছিলেন। **(খ) সাধারণ স্তরের নারী :** এই স্তরের নারীরা সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন। বিলুপ্ত প্রাচীন সভ্যতায় নারীর যে অবস্থান ছিল, তার চেয়ে খারাপ কিংবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আরও অধঃপতিত অবস্থায় ছিলেন এই শ্রেণির নারীরা। তাই কন্যা সন্তানের জন্ম বাবা-মা'য়ের নিকট খুবই কষ্টের কারণ ছিল। জন্মের সাথে সাথে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে বা কুয়ায় ফেলে মেরে ফেলত *(আন-নাহল, ১৬/৫৮; আত-তাকভীর, ৮১/৮-৯)*। সমাজে তাদের কোনো অধিকার স্বীকৃত ছিল না। বিবাহ, তালাক, সম্পত্তির অধিকার সর্বত্রই পুরুষদের একচেটিয়া অধিকার ছিল। ঠিকাবিবাহ, বহুবিবাহ, বদলিবিবাহ, মা ব্যতীত অন্যান্য সকল মহিলাকে বিবাহ প্রভৃতি বিবাহপ্রথা চালু ছিল। অধিকাংশ নারীকেই অধিকারবঞ্চিত ক্রীতদাসী হিসেবে ব্যবহার করা হতো। যেনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া সামাজিকভাবে উন্মুক্ত ছিল। ফলে নারী সাধারণ ভোগের সামগ্রী হিসেবেই ব্যবহৃত হতো।

৭. ইসলামে নারীর মর্যাদা : তৎকালীন বিশ্বের সার্বিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে ইসলামে নারীকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে ঘোষণা করা হয়েছে, ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ 'তারা (নারীরা) তোমাদের জন্য ভূষণস্বরূপ, তোমরা (পুরুষরা) তাদের জন্য ভূষণস্বরূপ' *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৭)*। একটি গাড়ির দু'টি চাকার অবস্থান নির্দিষ্ট আছে; কিন্তু চাকাদ্বয় স্ব স্ব স্থান থেকে সরে গিয়ে একত্রিত হলে যেমন দুর্ঘটনা ঘটা স্বাভাবিক, তেমনি নারী ও পুরুষ নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান না করে তবে সেখানেও দুর্ঘটনা ঘটবে। কিন্তু যদি নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা যায়, তবে সামাজিক পবিত্রতা বজায় থাকবে; মানব সভ্যতা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ 'তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত সেই, যে অধিকতর তাক্বওয়ার অধিকারী' *(আল-হুজুরাত, ৪৯/১৩)*। যেনা-ব্যভিচার, ঠিকাবিবাহ, বদলিবিবাহ, সাময়িক বিবাহ,

মুতা বিবাহ ইত্যাদিকে হারাম করে ইসলাম নারীর পবিত্রতা ও সতিত্বকে রক্ষা করেছে। পুরুষের ন্যায় নারীকেও স্বামী, সন্তান, পিতা ও ভাইয়ের সম্পত্তিতে অংশীদার করে নারীর সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করেছে ইসলাম। পুরুষের ন্যায় তাদের জন্য শিক্ষাকে অপরিহার্য ঘোষণা করে তাদের শিক্ষার অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। ১৪ জন নারীকে বিবাহ করা হারাম ঘোষণা করে তাদের মর্যাদার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। ক্রীতদাসীকে বিবাহ করে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে তাকে সম্মানিত জীবনযাপনের অধিক দেওয়া অত্যধিক ছওয়াবের কাজ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। বিবাহের সংক্রান্ত যাবতীয় জাহেলী রেওয়াজ বাতিল করে নারীর সম্মতি গ্রহণ, তাকে মোহরানা প্রদান এবং অলী ও সাক্ষীর মাধ্যমে বিবাহ বাধ্যতামূলক করে তার সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। তাদের খোলা তালাক ও বিধবা বিবাহের অনুমতি দিয়ে দুর্বিষহ বন্দি জীবন থেকে তাকে রক্ষা করা হয়েছে। 'নারী সকল অকল্যাণের মূল' এই জাহেলী ভ্রান্ত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করে আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ...وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ 'আমরা মানবজাতিকে সম্মানিত করেছি এবং অন্যান্য সৃষ্টির উপর মর্যাদা দান করেছি' *(বানী ইসরাঈল, ১৭/৭০)*। অতপর নারীর উপর পুরুষের যে কর্তৃত্ব ইসলাম ঘোষণা করেছে, তা মূলত সামাজিক শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে মানবিক অধিকারের ক্ষেত্রে নয়। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ 'তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল আর প্রত্যেককেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে'।[১]

মোটকথা, ইসলামপূর্ব সভ্যতাগুলোর বিপরীতে নারীকে মানব সভ্যতার অগ্রগতির অপরিহার্য অঙ্গ বলে গণ্য করেছে। ইসলামে নারী ভোগের পণ্য কিংবা অকল্যাণের উৎস কোনোটিই নয়; বরং তারা সমাজের অগ্রগতি, উন্নয়ন, সুখ-দুঃখ ইত্যাদির ক্ষেত্রে পুরুষের বিশ্বস্ত ও অপরিহার্য সঙ্গী। এভাবে যে ইসলাম নারীকে জাহেলিয়াতের শৃঙ্খল হতে মুক্ত করে এক অভাবনীয় জীবন ধারার সন্ধান দিয়েছে। তাকে মা, খালা, ফুপু, শাশুড়ি, বোন, কন্যা ইত্যাদি নাম দিয়ে সমাজে সম্মান ও শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন করেছে ইসলাম। সেই ইলাহী বিধানকে বর্জন করে প্রগতির নামে নারীর মর্যাদার প্রতীক পর্দাপ্রথাকে দূরে ছুড়ে ফেলে নারী সমাজকে আজ বাইরে বের হতে বাধ্য করা হচ্ছে। নারীর অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যকে স্বাধীনতা ও ফ্যাশনের নামে পুরুষের সামনে মেলে ধরা হচ্ছে। ফলে আগুন আর মোমের পাশাপাশি অবস্থানের ফলে যা ঘটার তাই ঘটছে। রোমান, গ্রীক, হেলেনীয় প্রভৃতি সভ্যতা ধ্বংসের মূল উৎস হিসেবে যেমনভাবে নারীকে প্রধান অনুঘটক করা হয়েছিল, ঠিক তেমনিভাবে আজকের আধুনিক সভ্যতা ধ্বংসের জন্য নারীর অবাধ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী তথাকথিত প্রগতিবাদীরাই দায়ী। পর্দাহীন নারী রাস্তায় চলবে, পাশাপাশি চেয়ারে কর্মক্ষেত্রে অবস্থান করবে, আর পুরুষ সহকর্মী তার দিকে লোভনীয় দৃষ্টিতে তাকাবে না এটা নিতান্তই বাস্তবতা বিরোধী কথা। আর এ কারণেই সমাজে ঘটছে যত অঘটন। আধুনিক যুগে নারী এখন সাধারণ পণ্যের চেয়েও সস্তা। সে এখন বিজ্ঞাপনের সৌন্দর্য বৃদ্ধির হাতিয়ার, সার্কাস, সিনেমা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য পুরুষ সমাজকে যেমন এগিয়ে আসা প্রয়োজন, তেমনি আত্মমর্যাদাহীন পর্দাহীন নারী সমাজেরও আত্মমর্যাদাবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়া জরুরী। ইসলাম নারীকে যেমন আত্মমর্যাদাবোধে উদ্বুদ্ধ করেছে, ঠিক তেমনি তাকে সমাজ জীবনে ইসলামের বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে। আদর্শ শিক্ষা ও ইসলামী বিধিবিধানের কঠোর অনুসরণ ব্যতীত সমাজে মর্যাদা নিয়ে তার বেঁচে থাকা অসম্ভব।

সুতরাং যতদিন নারী তার নিজস্ব গণ্ডির মধ্যে বিচরণ করার মানসিকতা অর্জন করতে পারবে না, ততদিন নিজেকে চরিত্রে, ব্যবহারে, আচরণে ও মানসিকতায় মহৎ ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন করে গড়ে তুলতে পারবে না। যতদিন নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা বন্ধ না হবে, উভয়ের কর্মস্থল পৃথক না হবে, রেডিও-টিভি, পত্র-পত্রিকা এবং চলচ্চিত্রে চরিত্র বিধ্বংসী প্রচার বন্ধ না হবে, ততদিন সে তার সম্মানজনক আসনে পৌঁছাতে পারবে না।

অতএব, আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন করার চেষ্টা করি এবং এর কঠোর অনুশীলনের মাধ্যমে আমাদের পরিবার ও সমাজকে উন্নত চরিত্র এবং নৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে তুলি। আসুন! আমরা আমাদের গৌরবময় হারানো অতীতকে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করি। আমাদের নারী সমাজকে ইসলামের প্রাথমিক যুগের নারীদের ন্যায় আদর্শবান করে গড়ে তোলার চেষ্টা করি। হে আল্লাহ! আমাদের নারী সমাজ যেন বিশ্বের দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে সেই তাওফীক্ব তুমি তাদেরকে দান কর। তাদেরকে তুমি আদর্শবান, ন্যায়পরায়ণ, দেশপ্রেমিক ও উন্নত মানবিক গুণসম্পন্ন করে গড়ে তোলো। আল্লাহ আমাদের মনের আশা পূরণ করে আমাদের সমাজকে একটি সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও আদর্শ সমাজ হিসেবে কবুল করো- আমীন!

১. ছহীহ মুসলিম, হা/১৮২৯।

জান্নাতের মেহমান

-মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ

গা শিউরে ওঠে! ছম ছম করে! তারা কেমন মানুষ? কী মহত্ত্ব লুকিয়ে আছে ওদের ভিতর? কেন এত মর্যাদা? ও, পরশ পাথরের সংশ্রবে থেকে থেকে তার গুণ লুফে নিয়েছে, তাই না? আসলে, আলোই অন্ধকারকে দূর করতে পারে। তেমনি অন্ধকার থেকে ওঠে এলেন এক যুবক। এলেন আলোর মানুষের সংস্পর্শে। ইসলামের আলোয় আলোকিত করলেন জীবন। মাত্র ১৭ বছর বয়সে।

এ ঘটনা, হিজরতের ৩০ বছর আগে যার জন্ম বনূ যুহরাহ গোত্রে। পিতা মালেক ইবনু ওয়াহিব। ইসলামের পতাকার তলে আশ্রয় নেওয়ার পর অনেক যুদ্ধে জীবনবাজি রেখেছেন। সেনাপতিও ছিলেন কোনো কোনো যুদ্ধে। তার দক্ষ ও কৌশলী পরিচালনায় মুসলিম সৈন্যরা অনেক বিজয় এনেছে। প্রিয় নবী ﷺ-এর একান্ত প্রিয়ভাজন। নবী ﷺ তাকে খুব ভালোবাসতেন। জীবিত থাকাকালেই মহানবী ﷺ তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেন।

এ জান্নাতী মেহমান কে জানো? আরবী ভাষায় যাদেরকে 'আশারায়ে মুবাশশারা' বলা হয়। নবী ﷺ-এরপ্রিয়ভাজন সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ رضي الله عنه। সা'দ رضي الله عنه মহানবী ﷺ-এর মায়ের চাচাতো ভাই। অর্থাৎ মহানবী ﷺ-এর সম্পর্কে মামা। প্রিয় ছাহাবী আবূ বকর رضي الله عنه ইসলাম গ্রহণের মাত্র কয়েক ঘণ্টা পর সা'দ رضي الله عنه ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয় নেন। কিন্তু সা'দ رضي الله عنه-এর ইসলাম গ্রহণ তার মামেনে নেননি। অনুরোধ করেন ইসলাম ধর্ম ছেড়ে দেওয়ার।শপথ করে বসেন, খানাপিনা করবেন না ইসলাম ছেড়ে না দিলে।

শুধু কি তাই? ছেলে সা'দকে মা মরে যাওয়ারও ভয় দেখান। তবুও যদি...। কিন্তু সা'দ رضي الله عنه অটল, অবিচল। কোনো কিছুই তাকে ইসলাম থেকেএক চুলবিচ্যুত করতে পারে না। মা কেন, নিজের গর্দান গেলেও ইসলাম ছাড়তে পারেন না এ যুবক। তিনি জানেন রাসূল ﷺ-এর ভালোবাসা, কোমল বচন, অপরিসীম অনুগ্রহ।

মা সা'দকে শেষটায় বললেন, তোমাদের ধর্মে তো মাকে মান্য করার কথা বলা হয়েছে। তবে কেন আমার কথা শুনছ না?

সা'দ رضي الله عنه-এর মা, তিন দিন কোনোকিছু খাননি এমনকি পানিও পান করেননি। এতে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। মায়ের প্রতি ছিল সা'দ رضي الله عنه-এর অকৃত্রিম ভালোবাসা। অমেয় করুণা। এক দিকে ইসলাম, অপর দিকে মা। কোন দিকে যাবেন তিনি। কাকে প্রাধান্য দিবেন। সৃষ্টির আনুগত্য করে তো স্রষ্টার নাফরমানী করা যাবে না। তাই ইসলাম ছাড়তে রাযী হননি। কত স্পষ্ট আওয়াজ! পর্বতসম দৃঢ় মনোবল! বলে দেন, মা তুমি আমার প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয়, কিন্তু তোমার মতো হাজার মা তাকীদ দিয়ে থাকলেও আমি পূর্ব ধর্মে ফিরে যাব না।

বয়কট করেন মক্কাবাসী বনূ হাশেম ও বনূ মুত্তালিবকে। অপরাধ! অপরাধ তো একটাই। তা তো আর কিছু নয়, ইসলাম। ইসলাম ধর্ম ছেড়ে দিলেই খালাস। বয়কটের চুক্তিনামা কা'বার দেয়ালে শোভা পায়। মহানবী ﷺ-কে হত্যার জন্য তাদের নিকট সোপর্দ করতে হবে নইলে এ বয়কট। দিনের পর দিন গাছের লতাপাতা, গাছের ছাল-বাকল খেয়ে জীবন কাটাতে হয়েছে মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে একটি গিরিপথে। এক রাতে সা'দ رضي الله عنه এক টুকরো শুকনো চামড়া পেলেন। সেটিকে সিদ্ধ করে খেলেন। কষ্টের জীবন! আহা কী কষ্ট! ছালাত আদায় অবস্থায় সা'দ رضي الله عنه-কে কতিপয় কাফের ঠাট্টা-বিদ্রুপ করলে সা'দ رضي الله عنه একাই তাদেরসাথে লড়াই করেন। সামান্যতম ভয় ছিল না অন্তরে। ভয় ছিল শুধু আল্লাহর। আর এমনটিই হওয়া দরকার। যাকে বলে ঈমানী শক্তি।

৬১৯ খ্রিষ্টাব্দে বয়কটের অবসান ঘটে। ফলে মুসলিমরা আবার তাদের বাড়ি-ঘরে ফিরে আসার সুযোগ পায়। কিন্তু নির্যাতনের স্টিম রোলার চরমে ওঠে। হুকুম হয় মুসলিমদের মদীনায় হিজরত করার।সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ رضي الله عنه ও এ সময় হিজরত করেন। সে সময় সা'দ رضي الله عنه-এর বড় ভাই উতবা মদীনায় বসবাস করত। উতবা উহূদের যুদ্ধে মহানবী ﷺ-এর মুখে পাথর ছুঁড়ে মারছিল। এতে মহানবী ﷺ আহত হওয়ায় সা'দ رضي الله عنه বড় ভাইকে ক্ষমা করেননি। শপথ করে বলেছেন, ইসলামের অন্য যে কোনো দুশমনের চেয়ে উতবাকে আমি বেশি ঘৃণা করি।

২য় হিজরী! শাওয়াল মাস! মক্কার কাফেররা ৩ হাজার পদাতিক সৈন্য ও ২ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে মদীনায় হামলা করে। মহানবী ﷺ ৭০০ মুসলিম যোদ্ধা নিয়ে উহূদ পর্বতের পাদদেশে উপস্থিত হয়ে মোতায়েনকৃত সৈন্যদের বাম পাশে সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ رضي الله عنه-কে দায়িত্ব দিলেন। তুমুল লড়াইয়ের এক পর্যায়ে মুসলিমরা যখন বেকায়দায় পড়ছিল, তখন তালহা ও সা'দ رضي الله عنهما-ই মহানবী ﷺ-কে রক্ষার জন্য পাশে দাঁড়িয়ে শত্রুর মোকাবিলা করছিলেন। রাসূল ﷺ এ সময় তীর রাখার থলি সা'দ رضي الله عنه-এর কাছেই রেখেছিলেন। রাসূল ﷺ-এর ভালোবাসা থেকে ক্ষণিক সময়ও বিচ্ছিন্ন হতে চাননি সা'দ। ভালোবাসার টানে নবী ﷺ-এর সাথে গিয়েছিলেন খন্দক, খায়বার, হুনাইন, তায়েফ ও তাবূক যুদ্ধসহ অনেক যুদ্ধে। হুদায়বিয়ার সন্ধিতে রাসূল ﷺ-এর পক্ষে যারা সই করেছেন, সা'দ رضي الله عنه তাদের একজন।

শুধু কি তাই? আবূ বকর رضي الله عنه-এর আমলে ইসলামী সরকারের যাকাত উত্তোলনের কাজও করেছেন। উমার رضي الله عنه-এর আমলে রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। উছমান رضي الله عنه-এর আমলে কূফার গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন। অসাধারণ বীর যোদ্ধা। বিনয়ী, কোমল। অনাড়ম্বর জীবনের অধিকারী। রাসূল ﷺ-এর ভালোবাসা তাকে নিয়ে গিয়েছিল এক সোনালি চত্বরে। ঈমানী শক্তি তাকে কখনো দমিয়ে রাখতে পারেনি।

সত্যের পথে সদা প্রস্তুত থেকে রাসূল ﷺ-এর বাহবা পেয়েছেন। দুনিয়ায় বসেই রাসূল ﷺ-এর মুখ থেকে শুনেছেন সুসংবাদ। জান্নাতের সুসংবাদ! এটাই তো শ্রেষ্ঠ পাওয়া। রাসূল ﷺ-এর মুখ থেকে জান্নাতের ঘোষণা! 'আশারায়ে মুবাশশারা' সে এক চরম পাওয়া। সংগ্রামী জীবনের জন্য। কী তেজস্বী পুরুষ! জান্নাতের মেহমান।

* মুহিমনগর, চৈতনখিলা, শেরপুর।

পর্দা

-মো. ফরহাদ খান,
চান্দিনা, কুমিল্লা।

ইসলাম নারীকে সম্মান দিয়ে করেছে ধন্য,
পশ্চিমা বিশ্ব নিজের স্বার্থে নারীকে করেছে পণ্য।
পর্দা ছাড়া নারী হয়ে গেল বন্য,
পর্দা করে যে নারী সে-ই তো ধন্য।
পর্দা শুধু নারীর নয়; পুরুষেরও জন্য,
তবুও যারা বুঝে না ইসলাম, তারা পেল শূন্য।
ইসলামের বিধান সকল সমস্যার সমাধানের জন্য,
মেনে চলবে যারা তাদের জীবন হবে ধন্য।

রঙিন মায়া

-মুস্তাকীম বিল্লাহ
বাগমারা, রাজশাহী।

এই যুগে ভাই ঈমান রাখা হয়ে গেছে দায়,
বাড়ি থেকে বের হলে সেটাই বোঝা যায়।
পুরুষ নারী মিলে এখন যেনায় লিপ্ত পথে,
ভালো মানুষ কেমন করে চলবে তাদের সাথে।
তাইতো যারা ভালো তাদের হয় না ধরায় ঠাঁই,
যুগের সাথে তাল মিলালে করবে আপন সবাই।
দুনিয়াদারির ভেজাল মায়ায় পড়ে যারা চলে,
কেমনে পাবে শান্তি তারা মুক্তি পরকালে।
রঙিন মায়ার রঙিন ঘরে অন্ধ সবার চোখ,
বিবেক ঘরে তালা মেরে পায় না খুঁজে সুখ।
রবের কাছে চাই যে পানাহ মায়া থেকে এই ধরার,
তিনি যেন তাওফীক্ব দেন সঠিক আমল করার।

নারীরা অর্ধেক

-শাজাহান কবীর শান্ত
প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত), রঘুনাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়,
রঘুনাথপুর, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা।

সংসারে সুখ আসে
নারী হলে সচেতন,
আজকাল এই নিয়ে
দেখি সব অচেতন।
ক্ষমতাতে নারীরাই
পুরুষের অর্ধেক,
কিছুকিছু সংসার
পুড়ে গেছে ঘর দেখ!
যেই নারী অর্ধেকের
বেশি করে দাবি ভাই
সেই সংসারে কোনো
মমতা, ভালোবাসা নাই।

মুনাজাত

-শাকিব হুসাইন
খানসামা, দিনাজপুর।

ছোট্ট সোনা খুকুমণি
তোলো দুটি হাত,
প্রভুর কাছে পাবে ক্ষমা
আর নবীর শাফাআত।
হাতটি তোলো প্রভুর দ্বারে
কান্না ছেড়ে দিয়ে,
জয় করে নাও প্রভুর সন্তোষ
হৃদয় ভরিয়ে।
পরকালের আশায় তুমি
করো ইবাদত,
দূর করে দাও দুনিয়ার
ঝামেলা যত সব।
ছোট্ট সোনা খুকুমণি
পড়ো ছালাত কালাম,
ঐ পারেতে পাবে তুমি
সুউচ্চ মাক্বাম।

ডায়াবেটিস

-মাখন চন্দ্র রায়
পাকেরহাট, খানসামা, দিনাজপুর।

অলস দেহটা তুমি আরামে ঘুমাও
খাও শুধু রাত-দিন মুরগি পোলাও।
কাজ নেই কাম নেই শুধু শুয়ে থাকা
ঘুরে ঘুরে স্বপ্নে তুমি ঘুরে এলে ঢাকা।
ভাত আলু খুব ভালো সেই সাথে মিষ্টি
থালা ভরা লুচি খাও সেই দিকে দৃষ্টি।
পেট ভরা খানাপিনা আর কিছু নাই
খাই খাই সদা ভাই বাকিটাও চাই।
সৃষ্টিকর্তা দিয়েছে মুখ কেমনে শাসাই
আহার দিয়েছে প্রভু খেতে বাধা নাই।
এমন বচন শুনে তো ভাই একেকজনে হাসে
ডায়াবেটিস কয় ভাইরে আমি আছি পাশে।

বাংলাদেশ সংবাদ

দেশে প্রতিদিন গড়ে ২৮ জন আত্মহত্যা করে

একাকীত্ব, মানসিক রোগ, অর্থনৈতিক সংকট, বেকারত্ব, পারিবারিক কলহ, মাদকাসক্তি ও দারিদ্র্যসহ নানা কারণে দেশে প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ আত্মহত্যা করছে। গত দুই বছরে করোনা সংক্রমণ চলাকালে আত্মহত্যার এই প্রবণতা আরো বেড়ে গেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, প্রতি বছর বিশ্বে যেসব কারণে মানুষের মৃত্যু ঘটে, এর মধ্যে আত্মহত্যা ১৩তম প্রধান কারণ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আত্মহত্যার প্রবণতার অন্যতম কারণ জেনেটিক (বংশানুক্রমিক) কারণ। আত্মহত্যার প্রায় ৫০ শতাংশ ক্ষেত্রেই জিনগত কারণ দায়ী। ফলে কোনো পরিবারে একজন আত্মহত্যা করলে এর প্রভাব অন্য সদস্যদের ওপরও পড়ে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর হিসাব মতে, বর্তমানে দেশে প্রতি লাখে ৮.০৫ শতাংশ মানুষ আত্মহত্যা করছে। এটাকে ২০৩০ সালের মধ্যে ২.৪ শতাংশে নামিয়ে আনতে সামাজিকভাবে নানা পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। বিবিএস সূত্র জানায়, সর্বশেষ ২০২০ সালের জরিপে দেখা যায়, প্রতি লাখে ৮.০৫ শতাংশ মানুষ আত্মহত্যা করে। সে সময়ে দেশের মোট জনসংখ্যা ধরা হয় ১৭ কোটি ১৬ লাখ। ২০২০ সালে সারা দেশে মোট ১৩ হাজার ৮১৪ জন মানুষ আত্মহত্যা করে। আত্মহত্যার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের গড় প্রায় সমান। ২০১৯ সালে প্রতি লাখে আত্মহত্যার হার ছিল ৭.৫৬ শতাংশ। তখন দেশের মোট জনসংখ্যা ধরা হয়েছিল ১৬ কোটি ৫৯ লাখ। সে হিসাবে ওই সময়ে দেশে মোট জনসংখ্যার ১২ হাজার ৯৫৮ জন মানুষ আত্মহত্যা করেছিল। এতেই স্পষ্ট হয়, দেশে আত্মহত্যার হার বাড়ছে। ২০১৫ সালে প্রতি লাখে ৭.৬৮, ২০১৬ সালে ৭.৮৪, ২০১৭ সালে ৩.৭৯ ও ২০১৮ সালে ৭.৬৮ শতাংশ মানুষ আত্মহত্যা করেছিল। ২০১৫ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত প্রতি লাখে আত্মহত্যার হার ৭ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও এটা এখন ৮ শতাংশের ওপরে চলে এসেছে। বিবিএস সূত্র জানায়, ২০২১ সালের প্রথম ১০ মাসে দেশে মোট মৃত্যুর কিছু কারণ খুঁজে বের করে বিবিএস। ১০ মাসে যখন করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে ৫ হাজার ২০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছে, তখন ১১ হাজারের বেশি মানুষ আত্মহত্যা করেছেন। মহামারির এ সময়ে দেশে শুধু হার্টঅ্যাটাক, হার্ট-ফেইলিওর ও হৃদরোগে প্রায় ১ লাখ ৮০ হাজার মানুষের মৃত্যুর তথ্য পাওয়া গেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, প্রতি বছর বিশ্বে ৮ লাখ লোক আত্মহত্যা করে। মৃত্যুর হার প্রতি লাখে ১৬ জন। ২০১৪ সালে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের এক গবেষণায় বলা হয়, বাংলাদেশে গড়ে প্রতিদিন ২৮ জন মানুষ আত্মহত্যা করে। আর পুলিশ সদর দফতরের হিসাবে বছরে গড়ে ১০ হাজার মানুষ ফাঁসিতে ঝুলে ও বিষপান করে আত্মহত্যা করে। এর বাইরে ঘুমের ওষুধ সেবন, ছাদ কিংবা উঁচু স্থান থেকে লাফিয়ে পড়া কিংবা রেললাইনে ঝাঁপ দেয়ার মতো ঘটনাগুলোও বিরল নয়।

সীমান্তে গত বছর ২৪৪ বার গুলি চালিয়েছে বিএসএফ

বাংলাদেশ সীমান্তে গত কয়েক বছরে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহারের একটি পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস। ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে পত্রিকাটি দাবি করেছে, ২০১৫ সাল থেকে সীমান্তে বিএসএফের প্রাণঘাতী অস্ত্রের ব্যবহারে তেমন হেরফের ঘটেনি। তবে বাংলাদেশ সীমান্তে গত বছর ২৪৪ বার গুলি চালিয়েছে বিএসএফ। একইভাবে প্রাণঘাতী নয় এমন পাম্প অ্যাকশন বা প্যালেট বন্দুকের ব্যবহারও করেছে তারা। সাধারণত বিএসএফ আন্তঃসীমান্ত অপরাধীদের আটকাতে এই প্যালেট বন্দুক ব্যবহার করে। ফলে এ সময়ে কমেছে গরু পাচারের মতো ঘটনা। খবরে বলা হয়, সীমান্তে ২০২১ সালে মাত্র ২০ হাজার ৪১৫টি গরু জব্দ করা হয়। যেখানে ২০১৫ সালে জব্দ করা হয়েছিল ১ লাখ ৫৩ হাজার ৬০২টি। এ ক্ষেত্রে ২০১৮ সাল ছিল টার্নিং পয়েন্ট। ওই বছর গরু চোরাচালান আগের বছরের প্রায় অর্ধেকে চলে আসে। এ ছাড়া অনুপ্রবেশ ও চোরাচালান রুখতে গত বছর বাংলাদেশ সীমান্তে ২৪৪ বার গুলি চালায় বিএসএফ। এর আগে ২০১৫ সালে ছিল ২১৯ বার এবং ২০১৬ সালে সর্বোচ্চ ৩৫৫ বার গুলি চালানো হয়েছিল। তবে ২০১৭ ও ২০১৮ সালে গুলির ঘটনা কিছুটা কমে। এ দুই বছর বিএসএফ গুলি চালিয়েছিল যথাক্রমে ১৩৯ ও ১৭৭টি।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

আমিরাতে কারাগারে ৬০৫ বন্দির কুরআন হিফয

কারাবন্দিদের পুনর্বাসনে বিভিন্ন কার্যক্রমের ব্যবস্থা করে থাকে আরব আমিরাত সরকার। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোর্স হলো সম্প্রদায়ভিত্তিক শিল্প কোর্স, গ্রাফিক ডিজাইন, ফিল্ম মেকিং, ইংরেজি ভাষা, চীনা ভাষা, রাগ নিয়ন্ত্রণ, চ্যালেঞ্জ ও সাফল্যের পথ, ক্রিয়েটিভ কোর্স ইত্যাদি। এর আগে ২০২০ সালে সায়েন্টিফিক কোর্স থেকে উপকৃত হয়েছেন ১৭০ জন বন্দি এবং শিক্ষা কোর্স থেকে উপকৃত হয়েছেন ১৯১ জন বন্দি। এরই ধারাবাহিকতায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় ধর্ম, খেলাধুলা ও পেশাদার বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রমে ১ হাজার ২২৮ জন বন্দিকে সম্পৃক্ত করেছে দুবাই পুলিশের শাস্তি ও সংশোধন প্রতিষ্ঠানের সাধারণ বিভাগ। ধর্ম শিক্ষা কার্যক্রমে পবিত্র

কুরআন পড়তে ও শিখতে বন্দিদের উৎসাহ দেওয়া হয়। ফলে গত দুই বছরে ধর্ম শিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নিয়ে পবিত্র কুরআন হিফয করেছেন ৬০৫ বন্দি। এ ছাড়া ২০২১ সালে ২৭৫ জন এবং ২০২০ সালে ৩৩৩ জন এই কার্যক্রমে অংশ নিয়ে উপকৃত হয়েছেন। দুবাইয়ের এডুকেশনাল জোন, স্থানীয় ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কলেজের সহায়তায় বন্দিরা নিজেদের শিক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করেন এবং নিয়মিত তাঁদের কাছে সর্বশেষ প্রকাশিত প্রয়োজনীয় সব বই সরবরাহ করা হয়।

ইসলামোফোবিয়া ছড়াতে ১০ কোটি ডলার অর্থায়ন!

আমেরিকাসহ গোটা পশ্চিমা বিশ্বে ইসলামোফোবিয়া বিস্তারের কথা সকলের জানা। তবে যেটা অজানা ছিল, তা হলো ইসলামোফোবিয়া প্রচারের জন্য মুসলিম বিদ্বেষী দলগুলোর কোটি কোটি ডলার অর্থায়ন। আমেরিকায় মুসলিমদের সমর্থন ও নাগরিক অধিকার নিয়ে কাজ করা সবচেয়ে বড় সংস্থা কাউন্সিল অন আমেরিকান-ইসলামিক রিলেশন্স (CAIR) তাদের এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ২০১৭ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত আমেরিকায় ইসলামভীতি ছড়াতে ১০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়ন করা হয়েছে। 'মূলধারায় ইসলামভীতি' নামের প্রতিবেদনে আমেরিকান-ইসলামিক রিলেশন্স (CAIR) বলেছে, ২৬টি মুসলিম বিদ্বেষী সংগঠনকে অর্থ দিয়েছে ৩৫টি দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও ফাউন্ডেশন। তারা সব মিলিয়ে ১০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ১০ কোটি ডলার অর্থায়ন করেছে ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ডে। ক্রিশ্চিয়ান অ্যাডভোকেটস ইভাঞ্জেলিসম ইনকর্পোরেট, ফিডেলিটি চ্যারিটেবল গিফট ফান্ড, শোয়াব চ্যারিটেবল ফান্ড, মার্কাস ফাউন্ডেশন, অ্যাডেলসন ফ্যামিলি ফাউন্ডেশন ও জিউস কম্যুনাল ফান্ড হলো সবচেয়ে বড় ছয়টি তহবিল সংস্থা, যারা আমেরিকার বুকে থাকা ইসলামবিরোধী সংগঠন ও চক্রগুলোকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করে থাকে। এসব ইসলামবিরোধী সংগঠন ও চক্রগুলো মার্কিন মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মিথ্যা তথ্য ছড়ায়। তারা সোশ্যাল মিডিয়া ও মূল ধারার মিডিয়া দিয়ে ইসলামোফোবিক প্রোপাগাণ্ডা জারি রাখে। এছাড়া জনসমাবেশে ভাষণ দেওয়াসহ বিভিন্ন উপায়ে ইসলামবিদ্বেষ ছড়ায় তারা।

মুসলিম বিশ্ব

ফিলিস্তীনীদের উপর ইসরাঈলের বর্ণবাদী আচরণ

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের নতুন এক রিপোর্ট বলছে, ইসরাঈলের ভেতর এবং অধিকৃত পশ্চিম তীরে ফিলিস্তীনীদের ব্যাপারে ইসরাঈলের নীতি, আইন, আচরণ প্রাতিষ্ঠানিক বর্ণবাদের সমতুল্য। রিপোর্টে বলা হয়েছে, ইসরাঈল এমন একটি নির্যাতনমূলক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা কায়েম করেছে, যা প্রয়োগ করে ফিলিস্তীনী জনগোষ্ঠীর ওপর কর্তৃত্ব চালানো যায়। ইসরাঈলের ইয়াহূদীদের স্বার্থে ফিলিস্তীনীদের ওপর নির্যাতন, তাদের ওপর কর্তৃত্ব এবং প্রাধান্য বজায় রাখতে ইসরাঈল রাষ্ট্র একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা কায়েম করেছে। আন্তর্জাতিক আইনে এ ধরনের 'অ্যাপারথাইড' অর্থাৎ নির্যাতন এবং বৈষম্যমূলক আইনের মাধ্যমে একটি জনগোষ্ঠীর ওপর অন্য জনগোষ্ঠীর কর্তৃত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা মানবতা-বিরোধী অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়। ইসরাঈলের প্রায় ৯৫ লাখ জনসংখ্যার ২০ শতাংশ আরব, যাদের অনেকেই নিজেদের ফিলিস্তীনী বলে পরিচয় দেয়। এছাড়া, পূর্ব জেরুজালেম এবং অধিকৃত পশ্চিম তীরে ২৯ লাখ ফিলিস্তীনী বসবাস করে। গাজায় রয়েছে ১৯ লাখ ফিলিস্তীনী। পশ্চিম তীরের সিংহভাগ এলাকাই ফিলিস্তীনী প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে, গাজা নিয়ন্ত্রণ করে হামাস।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

কৃষিক্ষেত্রে শ্রমিকের অভাব মেটাচ্ছে রোবট কৃষক

গ্রেট ব্রিটেন, জার্মানির মতো দেশগুলোতে হঠাৎ করেই কৃষিকাজ করার লোকের অভাব দেখা দিয়েছে। সেই সমস্যা মেটাতে সে দেশের কৃষিক্ষেত্রগুলোতে এবার দেখা মিলছে রোবট কৃষকের। ব্রিটেনে এরকম দুটি রোবট কৃষকের নাম টম এবং ডিক। কারো সাহায্য ছাড়াই নিরবচ্ছিন্ন কাজ করে চলে ফসলের মাঠে। ফসল লাগানোর আগে জমি প্রস্তুত করার জন্য কৃষকের মতোই মাঠ থেকে খুঁজে খুঁজে আগাছা তুলে রোবট দুটি। দুজনের মধ্যে কোনো কথা না হলেও একটি বিষয়ে মিল রয়েছে বেশ। আগাছা ঠেকাতে রাসায়নিক ব্যবহারে রাজি নয় কেউ। তারা প্রতিদিন প্রায় ৪৯ একর জমি থেকে আগাছা তুলতে পারে। অন্যদিকে জার্মানির অনেক অঞ্চলেই কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রমিক পাচ্ছেন না কৃষকরা। এই সমস্যার সমাধানে অনেকেই নিচ্ছেন রোবটের সাহায্য। ইতোমধ্যে ফসলের মাঠে আগাছা পরিষ্কারের কাজ শুরু করেছে রোবট। সেই রোবটের নাম 'বনিরোব'। চাষীরা মাঠে কাজ করার জন্য যথেষ্ট লোক পাচ্ছেন না। বনিরোব এই শ্রমিক ঘাটতি মেটাতে সক্ষম। সে আগাছা খুঁজে বের করে তা রাসায়নিক ছাড়াই ধ্বংস করতে সহযোগিতা করে। তবে রোবটটি এখনও শিখছে। বনিরোব এখন শুধু চেনে, কোন চারাটি দরকার, কোনটি দরকার নেই।

সওয়াল-জওয়াব

ফাতাওয়া বোর্ড, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

ঈমান-আক্বীদা

প্রশ্ন (১) : ফেরেশতা, ইবলীস কিংবা আদম-হাওয়া কি আল্লাহকে দেখেছে?

-শাহাদাত
আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তর: এ মর্মে সঠিক আক্বীদা হচ্ছে, চর্ম চক্ষু দ্বারা মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহকে দেখা অসম্ভব। জান্নাতীগণ আল্লাহকে জান্নাতে যাওয়ার পর দেখতে পারবেন। সুতরাং আদম আলাইহিস সালাম, ফেরেশতাগণ এবং ইবলীস কেউই আল্লাহকে দেখেননি। এমনকি মি'রাজের রাত্রিতে মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সরাসরি আল্লাহকে দেখেছেন এর কোনো প্রমাণ নেই। উমার ইবনু ছাবেত আল-আনসারী রহিমাহুল্লাহ বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, أَنَّهُ لَنْ يَرَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَّهُ حَتَّى يَمُوتَ 'নিশ্চয় মৃত্যুর পূর্বে কখনো তোমাদের কেউ আল্লাহকে দেখতে পারবে না' (তিরমিযী, হা/২২৩৫; সিলসিলা ছহীহা, হা/২৮৬২)। মহান আল্লাহ বলেন, 'দৃষ্টিসমূহ তাঁকে আয়ত্ব করতে পারে না। কিন্তু দৃষ্টিসমূহ তাঁর আয়ত্বে আছে এবং তিনি সূক্ষ দর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত' (আল-আন'আম, ৬/১০৩)। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'যে ব্যক্তি তোমাকে বলে যে, মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবকে দেখেছেন, সে মিথ্যা বলল' (ছহীহ বুখারী, হা/৪৮৫৫; মুসনাদে আহমাদ, হা/২৪২৭৩)। আবূ মূসা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচটি বিষয় নিয়ে আমাদের সামনে দাঁড়ালেন। (সেগুলোর মধ্যে একটি হলো) তাঁর পর্দা হচ্ছে নূর। তিনি তাঁর পর্দা তুলে নিলে তাঁর চেহারার জ্যোতি বা মহিমা তাঁর সৃষ্টির দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত সব কিছু ভস্মীভূত করে দিত (ছহীহ মুসলিম, হা/১৭৯; মিশকাত, হা/৯১)।

শিরক

প্রশ্ন (২) : বর্তমানে দেশে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র এবং উপার্জনের মধ্যে অধীনস্থতা বাধ্যতামূলক ও ইচ্ছাকৃত যে সকল শিরক ও হারাম মিশে আছে সেগুলো কী কী? তা স্পষ্ট করার জন্য অনুরোধ রইলো।

-এস. এম. মুশফিকুর রহমান
সাঁথিয়া বাজার, পাবনা।

উত্তর : কোন কর্মক্ষেত্রে কোন শিরক মিশে আছে তা এইভাবে বলা সহজ নয়। বরং ব্যক্তি কর্মক্ষেত্রে কোনো বিষয়ে শিরক বা হারাম মনে হলে, সাথে সাথে বিজ্ঞ আলেমদের নিকট থেকে জেনে নিয়ে তা থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা শিরকের সাথে কোনো প্রকারের আপোষ করা যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ 'নিশ্চয় যে ব্যক্তি শিরক করে আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাত হারাম করেছেন এবং তার অস্থান হবে জাহান্নাম' (আল-মায়েদা, ৫/৭২)।

বিদআত-কুসংস্কার

প্রশ্ন (৩) : শবে বরাত ইসলামী পরিভাষা না হলেও উপমহাদেশে শা'বান মাসের মধ্যবর্তী রজনীকে বুঝানো হয়। এ মর্মে হাদীছগুলোকে ত্রুটিপূর্ণ বলা হলেও ইবনু মাজাহতে বর্ণিত (১৩৯০ নং) হাদীছকে আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাসান বলেছেন। তাহলে আহলেহাদীছগণ একে বিদ'আত বলেন কেন?

-আব্দুর রাকিব
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তর : শবে বরাত ইসলামী পরিভাষা নয়, একথায় ঠিক। শবে বরাত বলে ১৫ শা'বান বুঝালেও তা পরিহার করতে হবে। কেননা তা রাসূল ছা. এর বলা শব্দ নয়। রাসূলুল্লাহ ছা. বলেছেন, 'নিসফ শা'বান'। সাথে সাথে শবে বরাত বলে, সমাজের লোক যা বুঝে তা ১৫ শা'বানের ঘটনা নয় বরং তা হয় রামাযান মাসের লায়লাতুল ক্বদরের রাত্রি। আর হাদীছ জাল বা যয়ীফ একথায় ঠিক। কারণ আলবানী (রহ) অত্র হাদীছের সূত্রকে যয়ীফ বলেছেন। তবে তিনি অন্যান্য সনদ ও 'শাহেদ'-এর উপর ভিত্তি করে হাদীছটিকে 'হাসান' বলেছেন (সিলসিলা ছহীহাহ, ৩/১৩৮ পৃ., হা/১১৪৪)। শায়খ আলবানী রহিমাহুল্লাহ-এর ইলম, মর্যাদা, গ্রহণযোগ্যতা সত্ত্বেও এই হাদীছটিতে তাঁর ইজতিহাদ বা গবেষণা আমাদের কাছে অগ্রাধিকারযোগ্য মনে হয়নি। কারণ, হাদীছটির অন্যান্য সনদ ও শাহেদ এমন ত্রুটিপূর্ণ, যা পরস্পর মিলেও 'গ্রহণযোগ্য' পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। বরং শবে বরাতের ফযীলত সম্পর্কিত হাদীছগুলো হয় জাল, না হয় দুর্বল (দ্রষ্টব্য : ইবনু রজব, লাত্বায়েফুল মা'আরেফ, পৃঃ ১৩৭; মাজমূ'উ ফাতাওয়া ইবনে বায ১/১৮৭ পৃ.)। তর্কের খাতিরে আমরা যদি ধরে নিই যে, শবে বরাতের ফযীলত সম্পর্কে 'গ্রহণযোগ্য' হাদীছ আছে, কিন্তু ঐ দিনে বা রাতে অতিরিক্ত ও বিশেষ কোন ইবাদত সম্পর্কে

'ছহীহ', 'হাসান' বা এমনকি 'অল্প যঈফ' হাদীছও বর্ণিত হয়নি। বরং এ সম্পর্কিত সব হাদীছ হয় অত্যন্ত দুর্বল, আর না হয় জাল। এজন্য, আহলেহাদীছগণ শুধু নয়; বরং সর্বযুগের জগদ্বিখ্যাত ওলামায়ে কেরাম শবে বরাত উপলক্ষ্যে বিশেষ ইবাদত-বন্দেগীকে বিদ'আত বলেছেন। এমনকি যে আলবানী রহিমাহুল্লাহ ইবনু মাজাহর উপর্যুক্ত হাদীছকে 'ছহীহ' বলেছেন, খোদ তিনিই বলেছেন, نعم لا يلزم من ثبوت هذا الحديث اتخاذ هذه الليلة موسمًا يجتمع الناس فيها، ويفعلون فيها من البدع 'তবে হ্যাঁ, এই হাদীছ প্রমাণিত হওয়ার অর্থ এই নয় যে, এই রাত্রিকে এমন মৌসুম হিসাবে গ্রহণ করতে হবে, যাতে মানুষ মসজিদে একত্রিত হবে এবং বিদ'আতসমূহ করবে' (আল-ক্বাসেমী, ইছলাহুল মাসাজিদ মিনাল বিদা' ওয়াল আওয়ায়েদ, পৃঃ ৯৯, টীকা নং ২)।

প্রশ্ন (৪) : জুম'আর খুৎবায় অনেক খতীব বলে থাকেন যে, রমাযান মাস পর্যন্ত জীবিত থাকার জন্য এবং রামাযানের ফযীলত লাভের জন্য اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ **এই দু'আটি বেশি বেশি পাঠ করা সুন্নাত। এই মর্মে সঠিক সমাধান জানতে চাই।**

-সোলায়মান
সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত দু'আটি সঠিক নয়। কারণ প্রশ্নে উল্লেখিত হাদীছটি যঈফ। এ হাদীছটি আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর মাধ্যমে যিয়াদ আন-নুমায়রী বর্ণনা করেন। ইবনু মাঈন তাকে যঈফ রাবী বলেছেন। আবূ হাতেম ইবনু হিব্বান বলেন, সে হলো মুনকারুল হাদীছ। তার বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ করা যাবে না। ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন তাকে পরিত্যাগ করেছেন (তাহযীবুল কামাল, ৫/১১৬)। সুতরাং এ হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না।

প্রশ্ন (৫) : রজব মাসের বিশেষ ছালাত 'ছালাতুর রাগায়েব' বলতে কোনো ছালাত আছে কি? থাকলে তা পড়ার পদ্ধতি কী?

-আব্দুর রহমান
পত্নীতলা, নওগাঁ।

উত্তর : ছালাতুর রাগায়েব বলতে রজব মাসে বিশেষ কোনো ছালাত কুরআন ও ছহীহ হাদীছে নেই। এমনকি কোনো ছাহাবী, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ থেকেও এর কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। বরং ইহা ৪৮০ হিজরীর পরবর্তীতে আবিস্কৃত একটি বিদ'আত (ফাতাওয়াল ইসলাম সুওয়াল-জাওয়াব, ১/৫২৫৭ পৃ.)। আর বিদ'আত প্রত্যাখ্যাত। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এমন কোন কর্ম করলো যা আমাদের শরীয়তে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত হবে' (ছহীহ বুখারী, হা/১৭১৮; মুসনাদে আহমাদ, হা/২৬২৩৪)। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করল, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত' (ছহীহ বুখারী, হা/২৬৯৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮; মিশকাত, হা/১৪০)।

ইবাদাত- পবিত্রতা

প্রশ্ন (৬) : মোবাইলে ভিডিও দেখলে বা গেম খেললে কি ওযূ নষ্ট হবে?

-ফয়সাল রায়হান
ইতালী প্রবাসী।

উত্তর : মোবাইলে ভিডিও দেখলে বা গেম খেললে ওযূ ভঙ্গ হবে না। তবে, গেমস খেলা হারাম। যা জুয়ার অর্ন্তভুক্ত। এছাড়াও মোবাইলে অশ্লীল উলঙ্গ অর্ধ উলঙ্গ ভিডিও ও স্থীর পিকচারের মাধ্যমে চোখের চেনা হয়। নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানের জন্য যেনার একটা অংশ নির্ধারিত রেখেছেন। সে তাতে অবশ্যই জড়িত হবে। চোখের যেনা হল তাকানো, জিহ্বার যেনা হল কথা বলা, কুপ্রবৃত্তি কামনা ও খায়েশ সৃষ্টি করে এবং যৌনাঙ্গ তা সত্য মিথ্যা প্রমাণ করে' (ছহীহ বুখারী, হা/৬২৪৩; আবূ দাউদ, হা/২১৫২; মিশকাত, হা/৮৬)। উল্লেখ্য যে, কোনো অশ্লীল ভিডিও দেখার কারণে উত্তেজনা বসত যদি যৌনাঙ্গ দ্বারা সাধারণ তরল পর্দাথ বের হয় তাহলে ওযূ ভেঙ্গে যাবে (ছহীহ মুসলিম, হা/৩০৩)।

ইবাদাত- ছালাত

প্রশ্ন (৭) : হায়েয শেষ হওয়ার পর ছালাতের ওয়াক্ত রয়েছে। কিন্তু পবিত্রতা সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে যদি ওয়াক্ত চলে যায়, তাহলে ঐ ছালাত কি ক্বাযা করতে হবে? যদি করতে হয় তাহলে নিয়ম কী?

-আবূ সাঈদ
বাসাইল, টাঙ্গাইল।

উত্তর : হায়েযগ্রস্ত নারীদের জন্য হায়েয চলাকালীন সময়ে ছালাতের বিধান নেই (ছহীহ বুখারী, হা/৩০৪; মিশকাত, হা/১৯)। আর ছালাতের জন্য পবিত্রতা শর্ত। কেননা পবিত্রতা ছাড়া ছালাত বৈধ নয়। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا 'আর তোমরা যদি অপবিত্র হয়ে যাও, তাহলে পবিত্রতা

অর্জন করো' (আল-মায়েদা, ৫/৬)। সুতরাং সম্ভবপর পবিত্রতা অর্জন করে ওয়াক্তের মধ্যে ছালাত আদায় করার চেষ্টা করবে অন্যথায় সেই ওয়াক্তের ছালাত ক্বাযা আদায় করবে। গোসল করা সম্ভব না হলে তায়াম্মুম করবে।

প্রশ্ন (৮) : 'রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর ছালাত বনাম প্রচলিত ছালাত' বইয়ে জানাযার জন্য ২টি দু'আ দেওয়া রয়েছে। দু'আ ২টি একসাথে পড়া যাবে কি? দু'আগুলো একাধিকবার পড়া যাবে কি?

-ফজলে রাব্বী
মহিমাগঞ্জ, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্দা।

উত্তর : 'রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর ছালাত বনাম প্রচলিত ছালাত' বইয়ে জানাযায় পঠিতব্য যে ২টি দু'আর কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা তৃতীয় তাকবীরের পর এক সাথে পাঠ করা যাবে। কেননা উল্লিখিত দু'আ দুটি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জানাযায় পাঠ করতেন (আবূ দাউদ, হা/৩২১০; তিরমিযী, হা/১০২৪; ইবনু মাজাহ, হা/১৪৯৮; মিশকাত, হা/১৬৭৫; ছহীহ মুসলিম, হা/৯৬৩, মিশকাত, হা/১৬৫৫)। আর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর জানাযার পদ্ধতি ছিল- প্রথম তাকবীর দিয়ে তিনি 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ-শায়ত্বনির রজীম' ও বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' পাঠ করে সূরা ফাতিহা ও অন্য যেকোনো একটি সূরা পাঠ করতেন (তিরমিযী, হা/১০২৬; নাসাঈ, হা/১৯৮৭; মিশকাত, হা/১৬৭৩)। অতঃপর দ্বিতীয় তাকবীর দিয়ে দরূদ পাঠ করতেন (সুনানুল কুবরা 'বায়হাক্বী', হা/৭২০৯; জামে'উল আহাদীছ, হা/৪২৭৫৩)। তৃতীয় তাকবীর দিয়ে মায়্যেত, উপস্থিত, অনুপস্থিত সকলের জন্য দু'আ করতেন (প্রাগুক্ত)। যেহেতু তিনি ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তৃতীয় তাকবীর পর দু'আ করতেন আর উক্ত দু'আ দুটি জানাযার দু'আ হিসাবে প্রমাণিত তাই তা তৃতীয় তাকবীরের পর এক সাথে পড়া যাবে।

প্রশ্ন (৯) : যোহর, আছর, মাগরিব এবং এশার ফরয ছালাতে এক বা দুই রাকা'আত ছুটে গেলে, ছুটে যাওয়া রাকা'আত আমি কিভাবে পড়ব?

-নাহিদ আলী
চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর : ইমামের সাথে যে কয় রাকা'আত ছালাত পাবে সে কয় রাকা'আত ছালাত হলো প্রথম ছালাত এবং ছুটে যাওয়া ছালাত হলো শেষের ছালাত। আলী ইবনু আবূ তালেব রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, তুমি ইমামের সাথে যে কয় রাকা'আত পেয়েছো তা তোমার প্রথম ছালাত, ক্বিরা'আতের যে কয় রাকা'আত তোমার ছুটে গেছে তা তুমি পূর্ণ করো (দারাকুৎনী, হা/১৫১৫, ইবনু আবী শায়বাহ, হা/৭১১৪)। সুতরাং চার রাকা'আত বিশিষ্ট ছালাতের এক বা দুই রাকা'আত ছুটে গেলে শুধুমাত্র এক বা দুই রাকা'আত পড়ে ছালাম ফিরাবে এবং এতে সূরা ফাতেহার সাথে অন্য সূরা মিলানো জরুরী নয়। কেননা, ঐ এক রাকআত বা দুই রাকা'আত তৃতীয় বা চতুর্থ রাকা'আত বলে গণ্য হবে। আর ইমামের সাথে পাওয়া ছালাত প্রথম বা দ্বিতীয় রাকা'আত বলে গণ্য হবে। আর তৃতীয় ও চতুর্থ রাকা'আতে সূরা ফাতেহার সাথে কেরাত মিলানো জরুরী নয়। আর তিন রাকা'আত বিশিষ্ট ছালাত তথা মাগরিবের ছালাতের এক রাকা'আত ছালাত ছুটে গেলে শুধু এক রাকা'আত পূর্ণ করবে এবং এতে সূরা ফাতেহার সাথে অন্য সূরা মিলানো জরুরী নয়। কেননা, তা তৃতীয় রাকা'আত বলে গণ্য হবে। আর মাগরিবের তৃতীয় রাকা'আতে কেরাত মিলাতে হয় না। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা আযান শুনতে পেলে ধীরস্থিরভাবে পায়ে হেটে ছালাতে যাও, দ্রুত যেও না। তোমরা ইমামের সাথে যে কয় রাকআত ছালাত পাবে তা আদায় করবে এবং যে কয় রাকা'আত পাবে না তা পূর্ণ করে নিবে (ছহীহ বুখারী, হা/৬৩৬; মুসনাদে আহমাদ, হা/১০৯০৬)। এমতাবস্থায় ইমামের সাথে প্রাপ্ত রাকা'আত প্রথম রাকা'আত হিসাবে গণ্য হবে। আলি ইবনু আবূ তালেব রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইমামের সাথে তুমি ছালাতের যেটুকু পাও তা তোমার ছালাতের প্রথমাংশ। সুতরাং ছালাতের যা ছুটে গেছে তা পূর্ণ করো (দারাক্বুতনী, হা/১৫১৫)।

প্রশ্ন (১০) : আমার বাবা পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত পড়েন। কিন্তু ছহীহ পদ্ধতিতে পড়েন না। তাকে বোঝানোর চেষ্টা করছি কিন্তু তিনি বুঝার চেষ্টা করেন না। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কী?

-মিম
রংপুর।

উত্তর : মানুষকে সঠিক দাওয়াত দিতে থাকতে হবে। আর ব্যক্তি যদি হয় আত্মীয়, তাহলে তাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব আরো বেশি। সুতরাং পিতার সম্মান-মর্যাদা ঠিক রেখে সুন্দরতম ভাষায় সঠিক পদ্ধতিতে ছালাত আদায়ের দাওয়াত দিতে থাকুন। আল্লাহ চাইলে হেদায়েত দান করবেন ইনশা-আল্লাহ। কেননা হেদায়াতের বিষয়টি আল্লাহর ক্ষমতায়। মহান আল্লাহ বলেন, '(হে নবী!) আপনি

যাকে পছন্দ করেন, তাকে হেদায়েত করতে পারবেন না, বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করেন (আল-ক্বছাছ, ২৮/৫৬)। সেক্ষেত্রে পিতাকে সঠিক আক্বীদার আলেমদের ছালাত বিষয়ে লিখিত বইগুলো পড়ার জন্য উপহার দিতে পারেন। উল্লেখ্য যে, এ জন্য পিতার সাথে কোনো ধরণের কটু বাক্য প্রয়োগ ও আচরণবিধি ভঙ্গ এবং সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না (আল-ইসরা, ১৭/২৩)।

প্রশ্ন (১১) : আমি একজন মেয়ে। আমার বয়স ১৮ বছর। আমি একটি মেসে থাকি। আমি নিয়মিত ছালাত পড়ি। কিন্তু আমার রুমমেট হিন্দু। হিন্দু মহিলাটির সামনে আমার ছালাত ছহীহ হবে কি? আর হিন্দু মেয়েটার সাথে একই রুমে থাকা শরীয়তসম্মত হবে কি?

-জিনাত
ঢাকা।

উত্তর : একান্ত কারণে কোনো বির্ধমীর সাথে এক রুমে বা পাশাপাশি অবস্থান করা যায়। তবে তাকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের সর্বনাশ করতে ত্রুটি করবে না' (আলে ইমরান, ৩/১১৮)। আরো অনেক আয়াতে অমুসলিমদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে মহান আল্লাহ নিষেধ করেছেন (আল-মায়েদা, ৫/৫১; আলে-ইমরান, ৩/১১৮; আল-মুজাদালা, ৫৮/২২)। সুতরাং মুসলিম ধার্মীক ব্যক্তির সাথে থাকার জন্য চেষ্টা করতে হবে। কেননা নবী ﷺ বলেছেন, 'মুমিন ব্যক্তি ছাড়া আর কাউকে সঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করবে না। আর মুত্তাক্বী ব্যতীত অন্য কেউ যেন তোমার খাবার না খায় (আবূ দাউদ, হা/৪৮৩২; মিশকাত, হা/৫০১৮)। রুমমেট হিসাবে যদি বির্ধমী রুমে থাকে এবং কোনো ছবি-মূর্তি না থাকে তাহলে সে রুমে ছালাত আদায় করা যায়।

প্রশ্ন (১২) : ফজরের ২ রাকা'আত সুন্নাত ও ফরযের মধ্যে না-কি আর কোনো ছালাত আদায় করা যায় না। এখন কেউ যদি ফজরের ২ রাকা'আত সুন্নাত ছালাত বাসায় পড়ে মসজিদে যায়; তাহলে আবার মসজিদে বসার পূর্বে ২ রাকা'আত ছালাত আদায় করতে পারবে কি?

-মো. বেলাল হোসেন
সাঘাটা, গাইবান্দা।

উত্তর : বসার প্রয়োজন হলে দুই রাকআত ছালাত আদায় করেই বসতে হবে। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন দুই রাকা'আত ছালাত না পড়ে যেন না বসে' (ছহীহ বুখারী, হা/১১৬৩; ছহীহ মুসলিম, হা/৭১৪)। তাই ফজরের সুন্নাত পড়ে মসজিদে প্রবেশ করলেও দুই রাকা'আত ছালাত আদায় করে বসতে হবে।

প্রশ্ন (১৩) : যে সমস্ত ইমাম মীলাদ-ক্বিয়াম করে এবং নবী ﷺ-কে নূরের তৈরি বিশ্বাস করে। দলীল দেওয়ার পরও সে তার এই বিশ্বাস থেকে ফিরে আসে না। এমন ইমামের পিছনে ছালাত হবে কি?

-আশরাফুল ইসলাম
উলিপুর, কুড়িগ্রাম।

উত্তর : বিশুদ্ধ আক্বীদার ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করতে হবে। নবী ﷺ গায়েব জানতেন, পীর-দরবেশ গায়েব জানেন এমন কুফুরী আক্বীদায় বিশ্বাসী ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করলে ছালাত হবে না। কেননা আল্লাহ ব্যতীত কেউ গায়েব জানে না (আল-আন'আম, ৫৯)। আর এমন বিশ্বাস ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। তবে আক্বীদা যদি এমন হয় যা বিদ'আতী বা ফাসেক্বী আক্বীদা প্রমাণ করে, তাহলে তার পিছনে সাময়িকভাবে ছালাত আদায় করা যেতে পারে। কেননা এমন আক্বীদা পোষণ করার কারণে ইমাম গোনাহগার হবেন। কিন্তু মুক্তাদীর ছালাত হয়ে যাবে। রাসূল ﷺ বলেন, 'অনেকেই তোমাদেরকে ছালাত আদায় করায়। তারা যদি ঠিক করে তাহলে তোমাদের জন্য নেকী রয়েছে। আর তারা যদি ভুল করে, তাতে তোমাদের নেকী হবে আর তাদের গোনাহ হবে' (ছহীহ বুখারী, হা/৬৯৪; মিশকাত, হা/১১৩৩)।

প্রশ্ন (১৪) : যোহরের পূর্বের চার রাকা'আত সুন্নাত ছালাতের প্রত্যেক রাকা'আতেই কি সূরা ফাতেহার সাথে অন্য সূরা পড়তে হবে?

-নূর জাহান
পলিখাঁপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : যোহরের পূর্বের চার রাকা'আতের শুধু প্রথম দুই রাকা'আতে মিলালেই চলবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ যোহর এবং আছরের ছালাতের প্রথম দুই রাকা'আতে সূরা ফাতেহা এবং অন্য দুটি সূরা আর শেষের দুই রাকা'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন। আর কোনো কোনো সময় তিনি ছাহাবীগণকে শুনিয়ে ক্বিরাআত করতেন। আর তিনি যোহরের প্রথম রাকাআত দীর্ঘ করতেন (নাসাঈ, হা/৯৮০)।

তবে প্রত্যেক রাকা'আতেও সূরা ফাতেহার সাথে অন্য সূরা মিলাতে পারে। আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যোহর কিংবা আছরের (রাবীর সন্দেহ) প্রথম দুই রাকা'আতের প্রতি রাকা'আতে ১৫ আয়াত পরিমাণ পাঠ করতেন এবং শেষের দুই রাকা'আতে অর্ধেক পরিমাণ পাঠ করতেন (ছহীহ মুসলিম, হা/৪৫২)। এতে বুঝা যায়, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো পরের দুই রাকা'আতেও অন্য সূরা মিলিয়েছেন।

প্রশ্ন (১৫) : ছালাতে সিজদারত অবস্থায় সিজদার তাসবীহ পড়ার পর আল্লাহর কাছে নিজ মাতৃভাষায় কিছু চাওয়া যাবে কি?

-মো. নূর হাসান
শেরপুর, ময়মনসিংহ।

উত্তর : ছালাতে সিজদারত অবস্থায় সিজদার তাসবীহ পড়ার পর আল্লাহর কাছে নিজ মাতৃভাষায় কিছু চাওয়া যাবে না। কেননা ছালাতে মানুষের পক্ষ থেকে কোনো কথা বলা সম্পূর্ণরূপে হারাম। কারণ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'নিশ্চয়ই ছালাত মানুষের কথাবার্তা বলার ক্ষেত্র নয়। এটা কেবল তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন তেলাওয়াতের জন্যই নির্দিষ্ট' (ছহীহ মুসলিম, হা/৫৩৭, আবূ দাঊদ, হা/৭৯৫; নাসাঈ, হা/১২০৩)। তবে কুনূতে নাযেলায় রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন ব্যক্তির নাম ধরে তাদের বিরুদ্ধে বদ-দু'আ করেছেন (ছহীহ বুখারী, হা/৮০৪; ছহীহ মুসলিম, হা/৬৭৫; মিশকাত, হা/১২৮৮)। তাই কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত দু'আগুলোই পড়া উচিত। এরপরও যদি কেউ আরও বেশি দু'আ করতে চায়, তাহলে ছালাতের সালাম ফিরানোর পর দুই হাত তুলে একাকী নিজ ভাষায় দু'আ করবে। কেননা দুই হাত তুলে দু'আ করলে আল্লাহ বান্দার খালি হাত ফেরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন (তিরমিযী, হা/৩৫৫৬)।

ইবাদাত- যাকাত

প্রশ্ন (১৬) : 'মাসিক আল-ইতিছাম' অক্টোবর ২০২১ সংখ্যার মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে, জিপিএফ (জেনারেল প্রভিডেন্ট ফান্ড)-এর টাকার যাকাত দিতে হবে। আমার প্রশ্ন হলো, জিপিএফ এর টাকা আমি ইচ্ছা করলে তুলতে পারি না। আমি যে প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করি সেখানে কয়েকবার আবেদন করেও তুলতে পারিনি। এ ক্ষেত্রে করণীয় কী?

-আনিসুর রহমান
নওগাঁ।

উত্তর : যাকাত দিতে হবে একথাই ঠিক। যদি তা উঠানো সম্ভব হয় তাহলে উঠিয়ে অন্যান্য সম্পদের সাথে মিলিয়ে যাকাত দিতে হবে। আর সম্ভব না হলে যাকাত দিবে না যখন টাকা উত্তলন করবে তখন শুধু এক বছরের যাকাত আদায় করে দিবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে বিধান চাপিয়ে দেন না' (আল-বাক্বারা, ২/২৮৬)।

ইবাদাত- ছিয়াম

প্রশ্ন (১৭) : নিছফে শা'বানের ফযিলত মর্মে বর্ণিত হাদীছের বিশুদ্ধ তাহক্বীক জানতে চাই।

-নাজমুল ইসলাম
ঢাকা।

উত্তর : নিসফে শা'বান সম্পর্কে যত হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তার কোনোটি হয়তো জাল না হয় জঈফ। যেমন এ প্রসঙ্গে একটি হাদীছ হলো, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যখন শা'বানের মধ্যরাত হবে তখন তোমরা রাতে ছালাত আদায় করো এবং দিনে ছিয়াম রাখো... (মিশকাত, হা/১৩০৮; ইবনু মাজাহ, হা/১৩৮৮)। এই হাদীছটি মাওযূ। এ হাদীছের সনদে 'ইবনু আবি সাবরাহ' নামে একজন রাবি আছে। তার ব্যাপারে ইমামদের মাঝে সমালোচনা রয়েছে। ইবনু হিব্বান বলেন, তার বর্ণিত হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না (তাহযীবুল কামাল, ৪/৪৮৯)। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, ইবনু আবি সাবরাহ হাদীছ যাল করতো (তাহযীবুল কামাল, ৩৩/১০২)। সুতরাং এ রাতে কুরআন তেলাওয়াত ও বিশেষ কোনো ছালাত নেই। আর যে সকল উলামায়ে কেরাম এ রাতের ফজিলত সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে থাকেন তাদের এ বর্ণনা ছহীহ নয়, বরং যঈফ।

প্রশ্ন (১৮) : জনৈক আলেম বলেছেন, শা'বান মাসে মালাকুল মাউত বেশি পরিমাণ রূহ কবয করে থাকেন। অর্থাৎ বেশি মানুষ মারা যায়। এমন কোনো ছহীহ হাদীছ বা আছার আছে কি?

-আব্দুল্লাহ
নওগাঁ।

উত্তর : শাবান মাসে মালাকুত মাউত বেশি পরিমাণ রূহ কবয করেন এমর্মে কোনো ছহীহ হাদীছ বা আছার বর্ণিত হয়নি। তবে পুরো বছরে যে সকল মানুষ মৃত্যুবরণ করে থাকে তাদের তালিকা শা'বান মাসে নির্ধারণ করা হয় মর্মে হাদীছ ও আছার বর্ণিত হয়েছে। তবে সেগুলো সবই

নিতান্তই যঈফ (সিলসিলা যঈফা, হা/৬৬০৭; ফাতহুল ক্বাদীর, ৪/৮০১; যঈফুল জামে‘, হা/৪০১৯; আদ-দুর্রুল মানছূর, ৭/৪০১-৪০২; তারিখে বাগদাদ, ৪/৪৩৬; মিযানুল ই‘তেদাল, ৪/৫০৭; মুসনাদ, ৮/৩১১)।

প্রশ্ন (১৯) : আমার বাবা মৃত্যুর পূর্বে দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার কারণে রমাযানের কয়েকটি ছিয়াম পালন করতে পারেননি। এজন্য তিনি খুবই মর্মাহত হোন এবং দুঃখ প্রকাশ করেন। তাই আমি উনার সন্তান হিসেবে ছিয়ামগুলো পালন করবো মর্মে কথা দেই। কিন্তু কয়েকজন বলল যে, ছিয়ামগুলো আমি পালন করলে বাবার পক্ষ থেকে আদায় হবে না বরং ফিদিয়া দিতে হবে। এ বিষয়ে সঠিক সমাধান দানে বাধিত করবেন।

-মো. সজিব খান
নান্দাইল, ময়মনসিংহ।

উত্তর : এমতাবস্থায় মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে অন্য কেউ ছিয়াম রাখতে পারবে না। বরং তার পক্ষ থেকে ছিয়ামের ফিদইয়া দিবে। মহান আল্লাহ বলেন, ‘যারা সামর্থ্যবান (কিন্তু ছিয়াম পালনে অক্ষম) তারা এর পরিবর্তে ফিদইয়া হিসাবে একজন মিসকীনকে খাদ্য দিবে’ (আল-বাক্বারা, ২/১৮৪)। উল্লেখ্য যে, ছিয়ামের ক্বাযা যিম্মায় রেখে কোনো ব্যক্তি মারা গেলে তার অভিভাবক তার পক্ষ থেকে ছিয়াম আদায় করবে’ মর্মে বর্ণিত হাদীছটি নযর তথা মানতের ছিয়ামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (ছহীহ মুসলিম, হা/১১৪৮; আবূ দাঊদ, হা/২৪০০)।

প্রশ্ন (২০) : ইয়াওমুশ-শাক বা সন্দেহের দিন বলতে কোন দিনকে বোঝানো হয়। এই দিনে কি গত বছরের ক্বাযা ছিয়াম পালন করা যাবে?

-আহমাদুল্লাহ
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : সন্দেহের দিন বলতে আরবী মাসের ৩০ তারিখকে বুঝানো হয়। উক্ত দিনে পূর্বের বছরের ছুটে যাওয়া ছিয়াম পালন করা যাবে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা এক বা দুই দিন পূর্বে ছিয়াম পালনের মাধ্যমে রমাযানকে অগ্রগামী কর না। তবে ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যে কোনো নির্দিষ্ট দিনে ছিয়াম পালন করে থাকে, তাহলে সে সন্দেহের দিনেও ছিয়াম পালন করবে (ছহীহ মুসলিম, হা/১০৮২; মুসনাদে আহমাদ, হা/১০৭৬৫)। অত্র হাদীছে নফল ছিয়ামের ব্যাপারে বৈধতা দেওয়া হয়েছে। যেমন: সোমবার ও বৃহস্পতিবারের ছিয়াম। তাহলে যেখানে নফল ছিয়ামের ব্যাপারেই ছাড় দেওয়া হয়েছে সেখানে ওয়াজিব ছিয়ামের ব্যাপারে ছাড় দেওয়া আরো শ্রেয় বা উত্তম। ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, সন্দেহের দিনে কাযা ছিয়াম, নযরের ছিয়াম ও কাফফারার ছিয়াম পালন করা বৈধ। কারণ সে দিনে যদি নফল ছিয়াম পালন করা যায়, তাহলে ফরয ছিয়াম পালন করা আরো উত্তম (আল-মাজমূ‘, ৬/৩৯৯)।

প্রশ্ন (২১) : শুনেছি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, অন্যান্য মাসের তুলনায় রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শা‘বান মাসে বেশি ছিয়াম পালন করতেন। তাহলে কি পুরো শা‘বান মাস ছিয়াম পালন করা যাবে?

-আব্দুর রহমান
মালোশিয়া।

উত্তর : রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শা‘বান মাসে অন্যান্য মাসের তুলনায় বেশি ছিয়াম পালন করতেন এ কথা ঠিক। তবে তিনি পুরো শা‘বান মাস অর্থাৎ ৩০ দিন ছিয়াম পালন করতেন না। বরং অল্প কয়েকদিন হলেও শেষের দিকে ছিয়াম রাখা বাদ দিয়েছেন। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে রমাযান ব্যতীত কোনো পূর্ণাঙ্গ মাস ছিয়াম পালন করতে দেখিনি। তবে অন্যান্য মাসগুলোর মধ্যে শা‘বান মাসে তিনি বেশি ছিয়াম পালন করতেন (ছহীহ মুসলিম, হা/১১৫৬; আবূ দাউদ, হা/২৪৩৪)। অপর বর্ণনায় রয়েছে, كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلاَّ قَلِيلاً ‘রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কয়েক দিন ব্যতীত পুরো শা‘বান মাস ছিয়াম পালন করতেন’ (ছহীহ মুসলিম, হা/১১৫৬)। উসামা ইবনু যায়েদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে তো শা‘বান মাসে যে পরিমাণ ছওম পালন করতে দেখি বছরের অন্য কোন মাসে সে পরিমাণ ছওম পালন করতে দেখি না। তিনি বললেন, ‘শা‘বান মাস রজব এবং রমাযানের মধ্যবর্তী এমন একটি মাস যে মাসের (গুরুত্ব সম্পর্কে) মানুষ খবর রাখে না অথচ এ মাসে আমলনামাসমূহ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকটে উত্তলোন করা হয়। তাই আমি পছন্দ করি যে, আমার আমলনামা আল্লাহ তা’আলার নিকটে উত্তোলন করা হবে আমার ছওম পালনরত অবস্থায় (নাসাঈ, হা/২৩৫৭)।

ইবাদাত- হজ্জ

প্রশ্ন (২২) : আমি হজ্জে গিয়ে রওযায় যে দুই রাকা‘আত ছালাত আদায় করতে হয় কোনো কারণবসত আমি তা করিনি। এখন আমার করণীয় কী?

-আবুল বাশার
নাটোর।

উত্তর : রসূল ﷺ-এর রওযাতে (কবরে) ছালাত আদায় করা শিরক। আর যে স্থানটুকুকে রাসূল ﷺ روضة من رياض الجنة (রওযাতুম মিন রিয়াযিল জান্নাত) বলেছেন, সেখানে দুই রাকা'আত ছালাত আদায়ের ব্যাপারে কোন হাদীছ নেই। বরং মাসজিদে নববী ছালাত আদায়ের কথা হাদীছে এসেছে। জাবির (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মাসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্য মসজিদের ছালাত অপেক্ষা আমার মসজিদের ছালাত হাজার গুণ উত্তম। অন্যান্য মসজিদের ছালাতের তুলনায় মাসজিদুল হারামের ছালাত এক লক্ষ গুণ উত্তম (ইবনু মাজাহ, হা/১৪০৬)।

কাফন-দাফন ও মৃতের বিধান

প্রশ্ন (২৩) : আছরের ফরয ছালাতের পরে নফল ইবাদত করা যায় না। প্রশ্ন হলো- আছর ছালাতের পর জানাযা দেওয়া যাবে কি-না? আমাদের এলাকায় বেশির ভাগ জানাযা আছরের পর হয়। হাদীছসহ উত্তর প্রত্যাশা করি।

-সবুজ ইসলাম
ভেড়ামারা কুষ্টিয়া।

উত্তর : রাসূল ﷺ সাধারণত আছর ছালাতের পর হতে সূর্য অস্তমিত যাওয়া পর্যন্ত এবং ফজরের ছালাতের পর থেকে সূর্য স্পষ্টভাবে প্রকাশ হওয়ার আগ পর্যন্ত কোনো ছালাত পড়তে নিষেধ করেছেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, ফজরের পর সূর্য উদিত হয়ে (একটু) উপরে না উঠা পর্যন্ত এবং আছরের পর সূর্য অস্তমিত না হওয়া পর্যন্ত কোন ছালাত নেই (ছহীহ বুখারী, হা/৫৮৬; মিশকাত, হা/১০৪১)। তবে ক্বাযা ছালাত আছরের পরে পড়া যাবে। কেননা ক্বাযা ছালাতের সময় হচ্ছে যখন তা স্বরণ হয়। হোক তা আছরের পর কিংবা ফজরের পর (আবূ দাউদ, হা/৪৩৫; সিলসিলা ছহীহা, হা/৩৯৬)। রাসূল ﷺ ব্যস্ততার কারণে যোহরের পরবর্তী ছুটে যাওয়া দুই রাকা'আত ছালাত আছরের পরে পড়ে ছিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/১২৩৩; মুসলিম, হা/৮৩৪; মিশকাত, হা/১০৪৩)। অনুরূপভাবে আছরের পরে জানাযা ও দাফন-কাফন করাতেও কোনো সমস্যা নেই। কেননা তিন সময়ে রাসূল ﷺ জানাযা ও কবরস্থ করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু আছরের পরের সময়টি তার অন্তর্ভুক্ত নয়। উক্ববা ইবনু আমের (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনটি সময়ে আমাদেরকে ছালাত আদায় ও মৃত ব্যক্তিকে দাফন করতে নিষেধ করতেন ১. যখন সূর্য উদয় আরম্ভ হয়, তখন থেকে সূর্য উপরে উঠা পর্যন্ত ২. ঠিক দ্বিপ্রহরের সময়, পশ্চিম আকাশে সূর্য ঢলে না পড়া পর্যন্ত এবং (৩) যখন সূর্য অস্তমিত হওয়ার উপক্রম হয়, তখন থেকে সূর্য অস্তমিত না যাওয়া পর্যন্ত (আবূ দাউদ, হা/৩১৯২; নাসাঈ, হা/৫৬০; মিশকাত, হা/১০৪০)।

প্রশ্ন (২৪) : পুরুষ ব্যক্তি মারা গেলে মহিলারা দেখতে পারবে কি? আর মহিলারা মারা গেলে পুরুষরা দেখতে পারবে কি?

-শরিফুল ইসলাম
ঝিনাইদাহ।

উত্তর : আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, মৃত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গা জীবিত অবস্থায় তার হাড় ভাঙ্গার ন্যায় (আবূ দাউদ, হা/৩২০৭; মিশকাত, হা/১৭১৪)। অত্র হাদীছের ব্যাখ্যায় ইবনু হাযার (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন, এই হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, মৃত্যুর পরে মুমিন ব্যক্তির সম্মান ঐরূপ অবশিষ্ট থাকে যেরূপ জীবিত অবস্থায় ছিল (ফাতহুল বারী, ৯/১১৩ পৃ.)। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, জীবিত অবস্থায় মাহরাম ও গায়রে মাহরামের বিধান যেমন কার্যকর মৃত্যুর পরেও তা বহাল থাকে। তাই কোনো নারী মৃত্যুবরণ করলে, নারী ও মাহরাম পুরুষ ব্যতীত কেউ তাকে দেখতে পারবে না। আর পুরুষ ব্যক্তি মারা গেলে মাহরাম নারী ও পুরুষ ব্যতীত কেউ তাকে দেখতে পারবে না। মৃত ব্যক্তির আবৃত শরীর দেখা জীবিত নারীর আবৃত শরীর দেখার নামান্তর (লাজনা দায়েমা, ২৪/৪২৩ পৃ.)।

প্রশ্ন (২৫) : আমাদের এলাকায় মানুষ মারা গেলে বাড়ি থেকে জানাযার স্থানে নেওয়ার সময় চল্লিশ কদম পর্যন্ত গণনা করা হয়। প্রতি দশ কদম পর পর খাটিয়া বহনকারীদের পরিবর্তন করা হয়। ইহা কতটা শরীয়া সম্মত?

-শামসুল আলম
উত্তরখান, ঢাকা-১২৩০

উত্তর : খাটিয়ায় বহন করে লাশ কবর স্থানে নেওয়ার সময় চল্লিশ কদম গণনা করে প্রতি দশ কদম পর পর খাটিয়া বহনকারীদের পরিবর্তন করার এই পদ্ধতি কুরআন, ছহীহ হাদীছ ও কোনো সালাফ দ্বারা প্রমাণিত নয়। সুতরাং এমন আমল সুস্পষ্ট বিদ'আত। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছে, 'কেউ যদি এমন আমল করে যাতে আমাদের নির্দেশনা নেই, তাহলে তা বর্জনীয়' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮)।

প্রশ্ন (২৬) : মৃত মহিলাকে গোসল দেওয়ার পর শরীরে আতর, করপুর, সুরমা লাগানো যাবে কি?

-শাহজালাল মিয়া
মাহিগঞ্জ, রংপুর।

উত্তর : মুহরিম ব্যতীত সাধারনভাবে মৃত্যুবরণকারী মায়্যেতের শরীরে বা কাফনের কাপড়ে, গোসলের সময় বা পরে সুগন্ধি জাতীয় জিনিসের ব্যবহার করা জায়েয। জাবের রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যদি তোমরা মায়্যেতকে সুগন্ধি লাগাও তাহলে তিনবার লাগাও (মুসনাদে আহমাদ, হা/১৪৫৮০)। আসমা' বিনতু আবূ বকর রাযিয়াল্লা-হু আনহা মৃত্যুর পূর্বে তার পরিবারের লোকদের অছিয়ত করে বলেন, আমি যখন মারা যাবো তখন তোমরা আমাকে সুগন্ধ ধুঁয়া দিবে অতঃপর সুগন্ধি ব্যবহার করবে (সুনানুল কুবরা বায়হাক্বী, হা/৬৯৫১; মুয়াত্বা, হা/৫৩০)। যায়নাব রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর গোসলের সময় রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কর্পুর (সুগন্ধি) ব্যবহার করতে আদেশ করেছিলেন (ছহীহ বুখরী, হা/১২৫৩)। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তির উট তার ঘাড় মটকে দিল। (ফলে সে মারা গেল)। আমরা তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে ছিলাম। সে ছিল ইহরাম অবস্থায়। তখন নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তাকে বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল করাও এবং দুই কাপড়ে তাকে কাফন দাও। তাকে সুগন্ধি লাগাবে না এবং তার মাথা আবৃত করো না। কেননা, আল্লাহপাক কিয়ামতের দিন তাকে মুলাব্বিদ অবস্থায় উঠিয়ে নিবেন (ছহীহ বুখারী, হা/১২৬৭)। অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, ইহরাম অবস্থায় মারা গেছেন এমন মায়্যেত ব্যতীত সকল ময়্যেতকে সুগন্ধি লাগানো যাবে। তবে সুরমা লাগানোর কথা হাদীছে পাওয়া যায় না। তাই এমনটি করা জায়েয নয় (ফাতওয়া আল লাজনাহ আদ দায়েমাহ, ৭/৩৪০)।

প্রশ্ন (২৭) : কোনো নারীকে যদি মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং তার কোনো অভিভাবক খুঁজে পাওয়া না যায়, তাহলে ঐ নারীকে আমরা কাফন-দাফন ও জানাযা পড়ে কবরস্থ করব না-কি আগুনে পুড়িয়ে কিংবা মাটিতে পুঁতে ফেলব? কেননা নারী হওয়ার কারণে মুসলিম না-কি অমুসলিম আমরা বুঝতে পারছি না।

-আব্দুস সামাদ
দুর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তর : অজ্ঞাত লাশের মধ্যে যদি কুফুরের লক্ষণ থাকে, যেমন: ক্রুশ, সিঁদুর, শাঁখা, ধুতি ও নিদির্ষ্ট ধর্মীয় পোষাক; তাহলে তাকে বিধর্মী গণ্য করে কাফন-দাফন ছাড়া মাটিতে পুঁতে দিবে। কেননা কাফেরের জানাযা পড়া ও তার জন্য দু'আ করা জায়েয নয়। এ জন্যই আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজ চাচা আবূ তালেবের মৃত্যুর পর তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলার নির্দেশ দেন। আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বললাম, আপনার বৃদ্ধ পথভ্রষ্ট চাচা মৃত্যুবরণ করেছেন, এখন কে তাকে দাফন করবে? তিনি বললেন, তুমি গিয়ে তোমার পিতাকে ঢেকে রাখো এবং তুমি আমার কাছে না আসা পর্যন্ত অন্য কিছু করবে না। অতঃপর আমি তাকে ঢেকে দিলাম। এরপর তার কাছে আসলাম। আমাকে নির্দেশ দেওয়ায় আমি গোসল করলাম এবং তিনি আমার জন্য দোয়া করলেন (আবূ দাউদ, হা/৩২১৪)। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর তাদের মধ্যে যে মারা গিয়েছে, তার উপর তুমি জানাযা পড়বে না এবং তার কবরের উপর দাঁড়াবে না। নিশ্চয় তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছে এবং তারা ফাসিক অবস্থায় মারা গিয়েছে' (আত-তওবা, ৯/৮৫)। আর যদি এমন প্রকাশ্য কোনো লক্ষণ পাওয়া না যায়, তাহলে তাকে সে দেশ বা শহরের মানুষের ধর্মের মানুষ গণ্য করে দাফন করবে। সুতরাং বাংলাদেশ যেহেতু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং অমুসলিম হওয়ার কোনো নিদর্শন নেই, তাই এমন নারী পাওয়া গেলে তাকে মুসলিম গণ্য করে কাফন-দাফন ও জানাযা পড়ে কবরস্থ করবে (লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ, ২১/৩২ পৃ.)।

প্রশ্ন (২৮) : আমরা জানি যে, মৃত ব্যক্তির বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার অনুষ্ঠান করা বিদ'আত। কিন্তু মৃত ব্যক্তির পরিবার ও দূর-দুরান্ত থেকে জানাযায় উপস্থিত হতে আসা লোকজন, আত্মী-স্বজনদের খাওয়া-দাওয়ার জন্য সমাজের পক্ষ থেকে নিজ অর্থায়নে ব্যবস্থা করা যাবে কি? বেঁচে যাওয়া টাকা কি করতে হবে?

-রমজান আলী
পত্নীতলা, নওগাঁ।

উত্তর : না, যাবে না। বরং যারা জানাযায় গিয়েছে তারা নিজ গতিতে ফিরে আসবে। এধরনের কোন অনুষ্ঠান করা যাবে না। উল্লেখ্য যে, মৃতের বাড়িতে খাবার পৌঁছানো সুন্নাত (আবূ দাউদ, হা/৩১৩২; ইবনু মাজাহ, হা/১৬১০)।

প্রশ্ন (২৯) : মৃত ব্যক্তির ভিডিও কিংবা অডিও লেকচার শোনা যাবে কি?

-মো. জহুরুল ইসলাম
পোরশা, নওগাঁ।

উত্তর : হ্যাঁ, মৃত ব্যক্তির ভিডিও কিংবা অডিও লেকচার শোনা যাবে। জীবিতাবস্থায় যেমন ব্যক্তির ভিডিও ও অডিও

লেকচার শুনে উপকৃত হওয়া যায় তেমনি ব্যক্তি মারা গেলেও তার ভিডিও ও অডিও লেকচার শোনা যায়। কেননা তার লেকচার থেকে যদি জাতি উপকার লাভ করতে পারে তাহলে প্রয়োজনের তাগিদে দ্বীন প্রচারের স্বার্থে ভিডিও লেকচারগুলো মিডিয়ায় রেখে দেওয়া যায় এবং তা থেকে দ্বীনি ইলম হাছিল করা যায়। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায় তিন প্রকার আমল ছাড়া। ১. সদাকাহ জারিয়াহ ২. এমন ইলম যার দ্বারা উপকার হয় ৩. পুণ্যবান সন্তান যে তার জন্যে দু'আ করতে থাকে (ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৩১)। রাসূল ﷺ আরো বলেছেন, যে ব্যক্তি কাউকে কল্যাণের পথ দেখাবে সে ঐ ব্যক্তির সমপরিমাণ ছওয়াব পাবে (ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৯৩; মিশকাত, হা/২০৯)।

প্রশ্ন (৩০) : মৃত ব্যক্তিকে কবরস্থ করার কয়েক মাস পর ধসে তা নিচু হয়ে যায়। ফলে সেখানে বিভিন্ন জীব-জন্তু বসবাস করতে আরম্ভ করে। আমরা কি কবরগুলি ভরাট করতে পারব? বা এ ক্ষেত্রে করণীয় কী? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হাফিযুর রহমান
মহাদেবপুর, নওগাঁ।

উত্তর : মৃত ব্যক্তিকে কবরস্থ করার পর ধসে যায় কিংবা নিচু হয়ে যায় এমন কবরকে ভরাট করার কোনো বিধি-নিষেধ শরীয়তে নেই। সুতরাং কবরকে বাঁশ জাতীয় বেড়া দিয়ে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। তবে তা আবশ্যক নয়। পরিবর্তন করতে চাইলে ভরাট করে দেওয়া যায় (ফতওয়া ইবনু তাইমিয়্যা, ৩১/২৬২ পৃ. দ্র.)।

ব্যবসা-বাণিজ্য

প্রশ্ন (৩১) : বিদেশী সৌখিন পাখিগুলো যেমন. লাভবার্ড, কোকাটেল, বাজরিকা ইত্যাদি ব্যবসার উদ্দেশ্যে খাচায় পালন করা যাবে কি?

-তৌহিদুজ্জামান সুজন
ঢাকা।

উত্তর : দেখতে সুন্দর, সুমধুর কণ্ঠের অধিকারী পাখি বিনোদন ও ব্যবসার উদ্দেশ্যে খাঁচায় রেখে যত্ন সহকারে পালন করা যায় (ফাতহুল বারী, ১/৫৪৮ পৃ.; লাজনা দায়েমা, ১৩/৩৮-৪০ পৃ.)। আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ সবচেয়ে বেশি সদাচারী ছিলেন। আমার এক ভাই ছিল; তাকে 'আবূ উমায়ের' বলে ডাকা হতো। আমার ধারণা যে, সে তখন মায়ের দুধ খেতো না। যখনই সে তাঁর নিকট আসত, তিনি বলতেন, হে আবূ উমায়ের! কি করছে তোমার নুগায়ের? সে নুগায়ের পাখিটি নিয়ে খেলত (ছহীহ বুখারী, হা/৬২০৩, ৬১২৯; ছহীহ মুসলিম, হা/২১৫০)। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণ হয় যে, আনন্দ ও বিনোদনের উদ্দেশ্যে পাখি পালন করা যায়। তবে, পশু-পাখিকে বন্দি করে খাবার ও থাকার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না দিয়ে কষ্ট দেওয়া যাবে না এবং তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'একজন মহিলা একটি বিড়ালের কারণে জাহান্নামে গিয়েছে, সে তাকে বেঁধে রেখেছিল। সে না তাকে খাবার দিয়েছিল, না তাকে ছেড়ে দিয়েছিল, যাতে সে যমীনের পোকা মাকড় খেতে পারত' (ছহীহ বুখারী, হা/৩৩১৮; ছহীহ মুসলিম, হা/২৬১৯)।

প্রশ্ন (৩২) : অনলাইন থেকে ইনকাম অর্থাৎ ফ্রিল্যান্সিং করে বা গ্রাফিক্স ডিজাইন করে ইনকাম করা কি জায়েয?

-আল-আমীন
ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ।

উত্তর : ইনকাম বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে মূল নীতি হচ্ছে, তা বৈধ পন্থায় বৈধ জিনিস হওয়া। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,রাসূলুল্লাহ ﷺ পাথর খন্ড নিক্ষেপের মাধ্যমে কেনা-বেচা ও প্রতারনামূলক ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন (ছহীহ মুসলিম, হা/১৫১৩; মিশকাত, হা/২৮৫৪)। সুতরাং যেকোনো বৈধ পন্থার বৈধ উপার্জন ইসলামে বৈধ ও হালাল। কেননা অবৈধ রিযিক্ব খেয়ে কারো ইবাদত আল্লাহ কবুল করবেন না। মহান আল্লাহ হালাল রিযিক্ব ভক্ষণ করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদের যেসব পবিত্র জিনিস রিযিক্ব হিসাবে দিয়েছি তা হতে খাও' (আল-বাক্বারা, ২/১৭২)। আবূ বারযা আসলামী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া পর্যন্ত কোনো বান্দা তার পদদ্বয় এক ধাপ নড়াতে পারবে না। ...তার সম্পদ সম্পর্কে কোথায় থেকে তা উপার্জন করেছে এবং কোথায় তা ব্যয় করেছে (তিরমিযী, হা/২৪১৭; মিশকাত, হা/৫১৯৭)। সুতরাং ফ্রিল্যান্সিং হচ্ছে অনলাইন ভিত্তিক একটি কর্ম ব্যবস্থা। একজন মানুষ যেমন চাকুরী, ব্যবসা করে অর্থ উপার্জন করে তদ্রুপ একজন ব্যক্তি অনলাইনে মুক্তভাবে বিভিন্ন কাজ করে অর্থ উপার্জন করতে পারে। সুতরাং ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকুরীর অর্থ হালাল ও বৈধ হওয়ার জন্য যেমন সূদ-ঘুষ, হারাম ও সকল ধরণের ধোঁকা থেকে মুক্ত

থাকা জরুরী। তদ্রুপ ফ্রিল্যান্সিং এর মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রেও সূদ-ঘুষ, হারাম, অবৈধ কাজ, থেকে মুক্ত থাকতে হবে। তবেই ফ্রিল্যান্সিং করে অর্থ উপার্জন করা বৈধ হবে।

প্রশ্ন (৩৩) : সিজিন্যাল ব্যবসার মধ্যে থেকে পাট এবং ধান এই দুটি পণ্য ৬ মাস অথবা তার বেশি সময় ধরে স্টক করে রাখা যাবে কি?

-আব্দুল খালেক
বদলগাছী, নওগাঁ।

উত্তর : ধান খাদ্যদ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বাজারে কৃত্রিম সংকট তথা সিন্ডিকেট তৈরি উদ্দেশ্য না হলে এবং বাজারে চাহিদা পরিমাণ পণ্য মজুদ থাকলে সাময়িকভাবে ধান গুদামজাত করণে কোনো সমস্যা নেই। বরং এমন গুদামজাতের ফলে খাদ্য সংকটের সময় মানুষ সহজে পণ্য হাতে পেয়ে থাকে। সুতরাং এমন উদ্যোগ প্রশংসনীয়। (আল-মুগনী, 'ইবনু ক্বুদামা', ৬/৩১৭)। আর সাময়িকভাবে এক বছরের জন্য খাদ্য মজুদ করা যায়। উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বনু নাযীরের খেজুর বিক্রি করতেন এবং তার পরিবারের জন্য এক বছরের খাদ্য জোগাড় করে রাখতেন (ছহীহ বুখারী, হা/৫৩৫৭)। তবে বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি করার উদ্দেশ্যে, পণ্যের মূল্য আকাশ চুম্বি করার লক্ষ্যে যেকোন পণ্য গুদামজাত করা হারাম এবং অভিশাপের কাজ। সুতরাং এমন উদ্দেশ্যে খাদ্য গুদামজাত করা যাবে না। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'গুনাহগার ছাড়া কেউ পণ্য গুদামজাত করে না' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৬০৫)।

বৈধ অবৈধ

প্রশ্ন (৩৪) : আমরা মোবাইলে টাকা রিচার্জ করি। ৪৯ টাকা রিচার্জ করলে ৫০ টাকা নেওয়া হয়, তাহলে ঐ এক টাকা বেশি নেওয়া জায়েয হবে কি?

-শরিফুল ইসলাম
ঝিনাইদাহ।

উত্তর : এধরনের লেনদেন করা জায়েজ নয়। কেননা একই জাতীয় জিনিসের ক্ষেত্রে কম-বেশি করে লেনদেন করা সূদ। আর সূদ ভক্ষণ করা হারাম। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছন, 'স্বর্ণ স্বর্ণের বিনিময়ে, রৌপ্য রৌপ্যের বিনিময়ে, গম গমের বিনিময়ে, যব যবের বিনিময়ে, খেজুর খেজুরের বিনিময়ে এবং লবন লবনের বিনিময়ে সমান সমান সমপরিমাণ ও হাতে হাতে (নগদ) হবে। অবশ্য এই দ্রব্যগুলো যদি একটা অপরটার সাথে বিনিময় হয়। (অর্থাৎ পণ্য এক জাতীয় না হয়) তোমরা যেরূপ ইচ্ছা করতে পার যদি হাতে হাতে (নগদে) হয়' (ছহীহ মুসলিম, হা/৪১৪৮; মিশকাত, হা/২৮০৯)। সুতরাং উক্ত এক টাকার কোনো বিনিময় না থাকায় তা হারাম।

পারিবারিক বিধান- বিবাহ-শাদী

প্রশ্ন (৩৫) : বিয়েতে আত্মীয়দের নিকট থেকে উপহার চেয়ে নেওয়া যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ আল মামুন
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : উপহার হচ্ছে যা কোনো ধরণের কামনা ছাড়া একে অন্যকে ভালোবাসার কারণে আনন্দ চিত্তে দিয়ে থাকে। আর চেয়ে নেওয়া একজন সামর্থবান ব্যক্তির জন্য লজ্জাকর। সুতরাং বিয়ে ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে আত্মীয়-স্বজনদের নিকট থেকে উপহার চেয়ে নেওয়া অত্যন্ত লজ্জাজনক এবং শরীয়ত সমর্থিতও নয়। হাকিম ইবনু হিযাম (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى 'উপরের হাত (দাতার হাত) নিচের হাত (গ্রহীতার হাত) থেকে উত্তম' (ছহীহ বুখারী, হা/১৪২৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৩৩)। তবে আত্মীয়-স্বজন আনন্দ চিত্তে কিছু উপহার দিলে তা গ্রহণ করা জায়েয ও উত্তম। উল্লেখ্য যে, বন্ধুত্বের খাতিরে কিছু চেয়ে নিলে তাতে কোনো সমস্যা নেই। কেননা একজন ছাহাবী রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট থেকে চাদর চেয়েছিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/১২৭৭)।

পারিবারিক বিধান- তালাক

প্রশ্ন (৩৬) : তালাক প্রদানের সঠিক পদ্ধতি কী? দলীলসহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : তালাক প্রদানের সঠিক পদ্ধতি হলো- তিন তুহুরে তিন তালাক প্রদান করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দিতে চাও তখন তাদেরকে তালাক দাও তাদের ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং ইদ্দতের হিসাব সঠিকভাবে গণনা করবে' (আত-তালাক, ৬৫/১)। এখানে ইদ্দত বলতে তুহুরকে বুঝানো হয়েছে (ছফওয়াতুত তাফাসীর, ৩/৩৭৫; আল-মুয়াসসার, ১০/১৬৮; আত-ত্বাবারী, ২৩/৪৩১; ফাতহুল কাদীর, ৭/২৩৯)। আল্লাহ তাআলা অন্য জায়গায় বলেন, 'তালাকপ্রাপ্তা মহিলারা যেন তিন কুরূ' পর্যন্ত নিজেদেরকে (পুনরায় বিয়ে) করা থেকে দূরে রাখে' (আল-বাকারা, ২/২২৮)। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে তার

স্ত্রীকে হায়েযা অবস্থায় তালাক দিলে উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লা-হু আনহু তার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমি তাকে ফিরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দাও। এরপর সে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত যেন বিরত থাকে। এরপর আবার হায়েযা হবে এবং পবিত্র হবে। এরপর চাইলে সে রাখবে অথবা স্পর্শের পূর্বেই তালাক প্রদান করবে। আর এটাই হলো সেই সময়সীমা যার ব্যাপারে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন (ছহীহ বুখারী, হা/৫২৫১; ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৭১)।

মাতার-পিতার মর্যাদা

প্রশ্ন (৩৭) : আমার মা টাকার লোভে কখনো কখনো মিথ্যা কথা বলে। আবার পরিবারে বিভিন্ন সমস্যার কারণে আমি আমার মাকে অনেক গালিগালাজ করি (তবে অকথ্য ভাষায় নয়) এবং পরে নিজেই অনুতপ্ত হই। এতে আমার মা আমার জন্য বদ দু'আ করে। এখন আমার করণীয় কী?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : পিতা-মাতার সাথে সর্বদায় ভালো ব্যবহার করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তাদের (পিতা-মাতাকে) উফ শব্দ বলো না এবং ধমক দিয়ো না, তাদের সাথে নরম ভাষায় কথা বলো' (আল-ইসরা, ১৭/২৩)। পিতা-মাতা মুশরিক হলেও তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে, খারাপ ব্যবহার করা যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'যদি তারা তোমাকে আমার সাথে শিরক করতে পিড়াপিড়ি করে যার ব্যাপারে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করো না, তবে তাদের সাথে দুনিয়ায় ভালো ব্যবহার করো' (লুক্বমান, ৩১/১৫)। আসমা বিনতু আবূ বকর বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর যামানায় আমার মুশরিকা মা আমার নিকট আসত। আমি এ ব্যাপারে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ফতওয়া জিজ্ঞস করে বললাম, আমার মা আমার কাছে আসে, সে ইসলাম বিদ্বেশী। আমি কি তারা সাথে সম্পর্ক বজায় রাখব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি তোমার মায়ের সাথে সদাচারণ করো। অন্যায় দেখলে তার প্রতিবাদ করতে হবে একথা ঠিক। তবে গালিগালাজ করে প্রতিবাদ করা এটা নীতি বিরুদ্ধ কাজ।

প্রশ্ন (৩৮) : আমার বাবা বিড়ি সিগারেট খায়। আর এর জন্য আমার নিকট টাকা চায় ঐ টাকা দেওয়া যাবে কি?

-শরিফুল ইসলাম
ঝিনাইদাহ।

উত্তর : দেওয়া যাবে না। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নেককাজ ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে, আর পাপকাজ ও সীমালংঘনের কাজে একে অন্যের সাহায্য করো না' (আল মায়েদা, ৫/২)। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ 'সৃষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির কেনো আনুগত্য নেই' (মুসনাদে আহমাদ, হা/১০৯৫; মিশকাত, হা/৩৬৯৬)। অত্র আয়াত এবং হাদীছ প্রমাণ করে যে, আল্লাহর অবাধ্যতায় কোনো ব্যক্তির আনুগত্য করা যাবে না। আর বিড়ি-সিগারেট খাওয়া হারাম। সুতরাং পিতাকে বিড়ি-সিগারেট কেনার জন্য টাকা দেওয়া যাবে না। বরং তাদেরকে বুঝাতে থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত এর মাধ্যমে অন্যায় কাজে সহযোগিতা হয়ে থাকে। আর অন্যায় কাজে সহযোগিতা করা হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা কর। মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো না' (আল-মায়েদা, ৫/২)।

পশু-প্রতিপালন

প্রশ্ন (৩৯) : ছহীহ হাদীছে এক পাপাচারী মহিলা কর্তৃক তৃষ্ণার্ত কুকুরকে কুয়া থেকে পানি উঠিয়ে পান করানোর প্রতিদানে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। আবার ছহীহ হাদীছে বলা হয়েছে, যে বাড়িতে কুকুর থাকে সেখানে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না। বিষয়টির ব্যাখ্যা জানতে চাই। মুমিন ব্যক্তি কি কোনো অসুস্থ বিপন্ন কুকুরকে তার বাড়িতে আশ্রয় দিলে তা ক্ষতিকর হবে?

-তাহেরা
রাজশাহী।

উত্তর : এক নারী কর্তৃক কুকুরকে পানি পান করিয়ে জান্নাত লাভের হাদীছটি ছহীহ বুখারীসহ বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। অত্র হাদীছের উদ্দেশ্য হলো, জীবের প্রতি দয়া করা। আর তা শুধু কুকুরের সাথে খাছ নয় বরং সকল প্রাণির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ 'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর প্রত্যেক জিনিসের প্রতি দয়া করাকে অত্যাবশ্যক করেছেন (ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৫৫)। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এক ব্যক্তি কুকুরকে পানি পান করালেন। আল্লাহ তার এই আমল কবুল করলেন যার ফলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! পশুর ব্যাপারেও কি আমাদের জন্য ছওয়াব রয়েছে? তিনি বললেন, প্রত্যেক জীবন্ত প্রাণির জন্য ছওয়াব রয়েছে (ছহীহ বুখারী, হা/৬০০৯; ছহীহ মুসলিম, হা/২২৪৪)। প্রাণি শিকারের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর ব্যতীত

শখের বসে কুকুর পালন করা যাবে না। কেননা অপ্রয়োজনীয় কুকুর পালনের কারণে প্রতিদিন বান্দার ছওয়াব হতে দুই ক্বীরাত পরিমাণ ছওয়াব কমে যায়। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন, 'যে ব্যক্তি শিকারী কুকুর কিংবা পশু রক্ষাকারী কুকুর ছাড়া অন্য কোন কুকুর পোষে, সে ব্যক্তির ছওয়াব থেকে প্রতিদিন দুই ক্বীরাত পরিমাণ কমে যায়' (ছহীহ বুখারী, হা/৫৪৮১; ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৭৪)। তবে অসুস্থতার কারণে সেবার উদ্দেশ্যে সুস্থতা অর্জন পর্যন্ত বাড়ি ব্যতীত কোনো সংরক্ষিত জায়গায় রেখে সেবা করা যেতে পারে।

হাদীছ- ছহীহ-যঈফ

প্রশ্ন (৪০) : 'কোনো বান্দার পাপ বেড়ে গেলে আল্লাহ তাকে বেশি সন্তান দিয়ে তার পাপ মোচন করে দেন' (মুসনাদে আহমাদ, হা/২৫২৩৬)। অত্র হাদীছটি কি ছহীহ?

-আব্দুল্লাহ
নওগাঁ।

উত্তর: প্রশ্নে উল্লেখিত হাদীছটি যঈফ। কারণ তাতে লাইছ ইবনু আবী সুলায়ম নামে একজন দূর্বল রাবী রয়েছে (তাখরীজুল ইহইয়া, ২/৪২; সিলসিলা যঈফা, হা/২৬৯৫)।

পোষাক-পরিচ্ছদ, হিজাব

প্রশ্ন (৪১) : মেয়েরা কি রেস্টুরেন্টে গিয়ে শুধুমাত্র খাওয়ার সময় মুখ খুলতে পারবে?

-তানজিনা সুলতানা সিনথী
সাদুল্যাপুর,গাইবান্ধা।

উত্তর : নারীগণ বাড়ির বাহিরে গমন করতে চাইলে, অবশ্যই পর্দা দ্বারা আবৃত হয়ে বের হবে। কেননা সৌন্দর্য পরিদর্শন করে ঘুরে বেড়ানো জাহিলী যুগের নারীদের অভ্যাস। এই মর্মে মহান আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে; প্রাচীন জাহেলী যুগের নারীদের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না' (আল-আহযাব, ৩৩/৩৩)। তিনি অন্যত্র বলেন, 'তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের উপর টেনে দেয় (যখন তারা বাড়ীর বাইরে যায়), এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে এবং তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না' (আল-আহযাব, ৩৩/৫৯)। সুতরাং নারীরা বাড়ির বাহিরে যাবে না। প্রয়োজনে যেতে হলে মাহরামের সাথে ও পূর্ণ পর্দাসহ যাবে (ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৩৮)। সুতরাং জরুরী কারণে যদি হোটেল বা রেস্টুরেন্টে যেতে হয় তাহলে, নির্জন ও নিরিবিলি স্থানে বসবে। এমতাবস্থায় মুখ খুলতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ 'তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় করো' (আত-তাগাবূন, ৬৪/১৬)।

প্রশ্ন (৪২) : আমরা ছহীহ হাদীছ থেকে জানতে পারি যে, অহংকারসহ ও অহংকার ছাড়া টাখনুর নিচে পুরুষদের জন্য কাপড় ঝুলানো জায়েয নাই। কিন্তু একটি নির্ভরোগ্য ফতওয়া ওয়েবসাইট-এ পড়লাম, চার মাযহাবের বেশির ভাগ আলেমের মতে অহংকার ছাড়া টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করা মাকরুহ বা জায়েয। অথচ আমরা উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর ঘটনা জানি, তিনি এক যুবককে কাপড় টাখনুর উপর উঠাতে বলেছিলেন। সঠিক সমাধান দিয়ে বাধিত করবেন।

-আহমেদ
ইসিবি চত্বর, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা -১২০৬।

উত্তর : কুরআন ও রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ছহীহ সুন্নাহ আমাদের জন্য অনুসরনীয়। সুতরাং ইমামদের কথা কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক হলে, তাদের কথা অবশ্যই গ্রহণীয়। আর যদি তা কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর বিপরীত হয় তাহলে, কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। আর ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত যে, টাখনু গিরার নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরিধান করা যাবে না। সুতরাং মুসলিম হিসাবে সকল মতামতকে অপেক্ষা করে সুন্নাহকে অগ্রাধিকার দেওয়া কর্তব্য। আর ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, টাখনু গিরার নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা হারাম এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'ইযারের বা পরিধেয় বস্ত্রের যে অংশ পায়ের গোড়ালির নীচে থাকবে, সে অংশ জাহান্নামে যাবে' (ছহীহ বুখারী, হা/৫৭৮৭; নাসাঈ, হা/৫৩৩১; মিশকাত, হা/৪৩১৪)। আবূ যার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'তিন শ্রেণির লোকের সাথে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের প্রতি দয়ার দৃষ্টি দিবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না, আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব'। আবূ যার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) এ কথা শুনার সাথে সাথে বলে উঠলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যাদের জন্য অধঃপতন ও ধ্বংস, তারা কারা? তিনি (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ১. 'যে লোক পরনের কাপড় পায়ের গিরার নীচে পরে, ২. যে দান করে খোটা দেয়, ৩. যে লোক নিজের মাল বেশি চালু (বিক্রয়) করার চেষ্টায় মিথ্যা কসম করে' (ছহীহ মুসলিম, হা/১০৬; মিশকাত, হা/২৭৫৯)। আর এসব হাদীছের বাস্তবতাতেই উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) ঐ যুবককে টাখনুর ওপরে কাপড় উঠাতে বলেছিলেন।

রাস্তার আদব

প্রশ্ন (৪৩) : মুহাম্মাদ ﷺ থেকে নির্দেশনা রয়েছে যে, রাস্তার ডান পাশ দিয়ে হাঁটতে হবে। কিন্তু সরকারি নিয়ম বাম পাশ দিয়ে হাঁটতে হবে। এখন আমাদের করণীয় কী?

-নিয়ামুল হাসান
শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : ইসলামের বিধান হলো- চলাচল ও গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে ডান পার্শ্ব দিয়ে চলা। দক্ষিণ এশিয়া ও ইউরোপের দেশসমূহসহ অনেক দেশে রাস্তার বাম পার্শ্ব দিয়ে চলাচল ও গাড়ি চালানোর আইন রয়েছে। যা জনগণকে মানতে বাধ্য করা হয়। বাধ্য হলে এমন আইন মেনে চলা যায়। কেননা এমন পরিস্থিতিতে সে নিরুপায়। আর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা যথাসম্ভব আল্লাহকে ভয় করো' (আত তাগাবুন, ৬৪/১৬)। ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, অচিরেই স্বজনপ্রীতি প্রকাশ পাবে এবং এমন সব কর্মকান্ড ঘটবে যা তোমরা অপছন্দ করবে। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তদাবস্থায় আমাদের কী করতে বলেন? নবী ﷺ বললেন, তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করো, আর তোমাদের প্রাপ্যের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করো (ছহীহ বুখারী, হা/৩৩৪৬, ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৪৩)।

চিকিৎসা

প্রশ্ন (৪৪) : যে ব্যক্তি যাদু ও কুফুরী কালাম দ্বারা আক্রান্ত তারা কিভাবে চিকিৎসা গ্রহণ করবে?

-গোলাম নূর
খুলনা।

উত্তর : যাদু, কুফুরী কালাম বা জিন দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির শারয়ী চিকিৎসা পদ্ধতি নিম্নোরূপ: ১. কোন জিনিস দ্বারা যাদু করা হয়েছে এবং তা কোথায় রাখা আছে? তা যদি অবগত হওয়া যায়, তাহলে সর্বপ্রথম তা তুলে নষ্ট করে ফেলতে হবে। এতে যাদুর প্রভাব নষ্ট হয়ে যাবে (ছহীহ বুখারী, হা/৩২৬৮)। ২. কী দ্বারা যাদু করেছে তা যদি জানা না যায় কিন্তু যাদুকরকে চেনা যায়, তাহলে তাকে যাদু নষ্টের জন্য চাপ প্রয়োগ করতে হবে। সে যাদু নষ্ট করে দিলে আরোগ্য লাভ করা যাবে ইনশা-আল্লাহ (প্রাগুক্ত)। ৩. কুরআন ও সুন্নাহ'তে বর্ণিত আয়াত ও দু'আগুলো পাঠ করা ও সেগুলো পাঠ করে ঝাড়-ফুঁর মাধ্যমে আরগ্য লাভ করা যায়। এক্ষেত্রে যেকোনো শিরক মুক্ত দু'আ পাঠ করা যায়। রাসূল ﷺ বলেন, 'মন্ত্রের মধ্যে যখন শিরকের কিছু থাকবে না, তখন তা করাতে কোন ক্ষতি নেই (ছহীহ মুসলিম, হা/২২০০; মিশকাত, হা/৪৫৩০)।

নামকরণ

প্রশ্ন (৪৫) : কারো নাম যদি আব্দুল মতিন, আব্দুল বারী, আব্দুর রহিম হয় তাহলে নামের শুরু থেকে 'আব্দুল, আব্দুর' বাদ দিয়ে ডাকলে গুনাহ হবে কি?

-আব্দুর রাকিব
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তর : আল্লাহর সত্ত্বার সাথে খাছ এবং বান্দার জন্য প্রযোজ্য নয় এমন গুণ বিশিষ্ট নামের শুরুতে عبد ('আব্দুল বা আব্দুর') যুক্ত করা আবশ্যক। কেননা এমন নামের শুরুতে عبد যুক্ত না করলে সৃষ্টিকে স্রষ্টার স্থানে বসানো হবে। যেমন. الرَّحْمَانْ ، الرَزَّاقْ، الخَالِقْ، الحيّ ، القَيُّوْم، الجَبَّارْ، المُصَوِّرْ ، (আর রহমান, আর রাযযাক্ব, আল খালেক্ব, আল হাই, আল ক্বইয়্যুম, আল জাব্বার, আল মুছাওয়ের) ইত্যাদী। সুতরাং এ সকল নামের শুরুতে আব্দুর বা আব্দুল যুক্ত করে নাম রাখতে হবে এবং বলতে হবে। আর যে সকল গুণ বিশিষ্ট নাম আল্লাহর কর্ম বোঝায় এবং তা আল্লাহর জন্য খাছ নয়, সেগুলোর পূর্বে আব্দুর বা আব্দুল যুক্ত করা ভালো তবে জরুরী নয়। যেমন. نَافِعْ، عَلِيْ 'নাফে' আলী' (তুহফাতুল মাওদুদ, ১২৫ পৃ.; আসনাল মাত্বালেব শারহু রাওযাতুত ত্বলেব এর টিকা, ৪/২৪৩ পৃ.)।

প্রশ্ন (৪৬) : আমার নাম 'মো. ইয়ানবী'। নামটি কতটা শরীয়তসম্মত? পড়াশোনা শেষ করে চাকুরী করছি। নাম পরিবর্তন করা সম্ভব না হলে করণীয় কী?

-মো. ইয়ানবী
নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : মুসলিম ব্যক্তির নাম শিরক মুক্ত সুন্দর অর্থপূর্ণ হওয়া বাঞ্চনীয়। আর ইয়া নবী অর্থ হে নবী!। নবী ব্যতীত কাওকো হে নবী! বলা যাবে না। মূলত নূর নবী, ইয়া নবী এই নামগুলো বিদ'আতীদের থেকে এসেছে। সুতরাং এমন নাম জরুরী ভিত্তিতে পরিবর্তন করতে হবে। কেননা রাসূল ﷺ এমন নাম পরিবর্তন করে দিতেন। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ (এক নারীর) আছিয়া 'পাপিষ্ট' নাম পরিবর্তন করে বলেন, তোমার নাম জামিলা 'সুন্দরী' (ছহীহ মুসলিম, হা/২১৩৯; আবূ দাউদ, হা/৪৯৫১)। উল্লেখ্য যে, এফিডেভিট এর মাধ্যমে নাম পরিবর্তন করা যায়।

ইবাদাত- প্রার্থনা

প্রশ্ন (৪৭) : আমরা জানি যে, দু'আর শুরুতে হামদ ও দরূদ পাঠের কথা হাদীছে বর্ণিত হয়েছে (তিরমিযী, হা/৩৪৭৬)। দু'আর শেষে এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু অনেক দু'আর বইয়ে দু'আর শেষে হামদ ও দরূদ পাঠের কথা লিখা আছে। প্রশ্ন হলো- হামদ ও দরূদ দ্বারা দু'আ শেষ করা কি শরীয়তসম্মত?

-মো. মিনহাজ পারভেজ
হড়গ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : হামদ তথা আল্লাহর প্রশংসা ও দরূদ পাঠের মাধ্যমে দু'আ আরম্ভ করলে, দু'আ কবুল হয় একথা ঠিক (তিরমিযী, হা/৩৪৭৬; ছহীহ আবূ দাঊদ, হা/১৩৩১)। আলবানী রাহিমাহুল্লাহ-র লিখিত 'ছিফাতু ছালাতিন্নবী' বইয়ে সূরা ইউনূসের ১০ নং আয়াতের আলোকে দু'আ শেষে হামদ পাঠের বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 'আর তাদের প্রার্থনার সমাপ্তি হয় 'সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের রব আল্লাহর জন্য' (ইউনূস, ১০/১০)। তবে দু'আর শেষে দরূদ পাঠের কোনো বর্ণনা ছহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়নি। তাই শেষে দরূদ পাঠ করার সাথে দু'আ কবুলের কোনো সম্পর্ক নেই।

প্রশ্ন (৪৮) : আমি শুনেছি যে আল্লাহর ৯৯টি নাম পড়ে কেউ যদি হাত তুলে দু'আ করে, তাহলে তার দু'আ কবুল হয়, এ কথা কি ঠিক?

-জুলকার
ঢাকা।

উত্তর : হ্যা, আল্লাহর গুণবাচক নাম উল্লেখ করে দু'আ করলে দু'আ কবুল হয়। মহান আল্লাহ বলেন, 'সুন্দর সুন্দর নামসমূহ তাঁরই। অতএব তোমরা এই নামগুলো ধরে তাঁকে ডাকো (আল-আ'রাফ, ৭/১৮০)। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহর ৯৯টি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি ঐ নামগুলোর প্রতি বিশ্বাস রাখবে অথবা ধারাবাহিকভাবে পড়বে বা মুখস্থ রাখবে সে জান্নাতে যাবে (ছহীহ বুখারী, হা/২৭৩৬; ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৭৭; মিশকাত, হা/২২৮৭)। উল্লেখ্য যে, হাত তুলে দু'আ করা যায়। কেননা কেউ হাত তুলে দু'আ করলে আল্লাহ তার খালি হাত ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন (তিরমিযী, হা/৩৫৫৬)।

বিবিধ

প্রশ্ন (৪৯) : এক প্রতিবেশি থেকে অপর প্রতিবেশি যদি খুবই সামান্য পরিমাণ (৫০, ১০০ গ্রাম) লবন ধার নেয় তাহলে সেটা ফেরত না নেওয়ার ব্যাপারে ইসলাম কিছু বলেছে কি? আমি শুনেছি লবন, পানি কাউকো দিলে তা ফেরত নিতে হয় না।

-ইব্রাহিম
উত্তরখান, ঢাকা।

উত্তর : ঋণস্বরূপ নিলে অবশ্যই তা পরিশোধ করতে হবে। কেননা হুনায়ন যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবীগণকে নিয়ে গনীমতের উটের পাশে ছালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি উটের দেহ থেকে পশম নিয়ে তা তাঁর দু' আঙ্গুলের মাঝে রেখে বললেন, হে লোকসকল! অবশ্যই এটা তোমাদের গনীমতের মাল। সুতা এবং সুঁই, আর যা তার চেয়ে পরিমাণে বেশী এবং যা তার চেয়ে কম, সবই তোমরা গনীমতের মালের মধ্যে জমা দাও। কেননা গনীমতের মাল চুরি করার ফলে কিয়ামতের দিন তা চোরের জন্য অপমান ও গ্লানি এবং জাহান্নামের শাস্তির কারণ হবে' (ইবনু মাজাহ, হা/২৮৫০, সিলসিলা ছহীহা, হা/৯৮০)। পানি, লবণ, আগুন চাইতে আসলে তা বাধা দেওয়া যাবে না মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ (ইবনু মাজাহ, হা/২৪৭৪)।

প্রশ্ন (৫০) : আমি কিছু অমুসলিমদের ইসলামের দাওয়াত দিয়েছি। ডা. জাকির নায়েকের লেকচার দেখে তারা ইসলাম সম্পর্কে জানতে অনেক আগ্রহী। তারা পবিত্র কুরআন পড়তে চায়। তাদেরকে আমি কুরআন মাজীদ উপহার দিতে চাচ্ছি। আমি কি তাদেরকে কুরআন মাজীদ দিতে পারব? যদি দিতে পারি তাহলে নির্ভরযোগ্য অনুবাদ গ্রন্থ কোনটি দয়া করে জানাবেন।

-মো. হোসেন আলী
শৈলকূপা, ঝিনাইদাহ।

উত্তর : কোনো অমুসলিমকে কুরআন মাজিদের মূল কপি দেওয়া যাবে না। কেননা মুশরিকরা হলো নাপাক। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় মুশরিকরা হলো নাপাক' (আত-তওবা, ৯/২৮)। যদিও সে কুরআন নিয়ে গবেষণা করার আশা ব্যক্ত করে। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, নিশ্চয় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রু ভুখন্ডে কুরআন নিয়ে সফর করতে নিষেধ করেছেন (ছহীহ বুখারী, হা/২৯৯০; ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৬৯)। তবে অমুসলিমকে পুরো কুরআন মাজীদ নয়, বরং কুরআনের কিছু অংশ বিশেষ দেওয়া যেতে পারে। আর নির্ভরযোগ্য অনুবাদগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে আধুনিক প্রকাশনী হতে প্রকাশিত অনুবাদ।